

মাসিক
আল্‌ যুয়ুফান

শা'বান-রমায়ান ১৪৩৬ | জৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২২ | জুন ২০১৫



আল যুরকান

শাবান-রমযান ১৪৩৬ | জৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২২ | জুন ২০১৫

- উপদেষ্টা সম্পাদক
আল্লামা শাইখ ইসমাইল হুসাইন আল-মাদানী
আল্লামা শাইখ সুলাইমান আল-উকাইলী
প্রফেসর ড. নাসরুল্লাহ আল-মানসূর
- সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
শাইখুল হাদীস আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা
- প্রধান সম্পাদক
ড. এবিএম সিদ্দীক
- সহ-সম্পাদক
উমার ইবনু আদির রহমান
- নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ তানভীর আহসান
- ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মু'তাসিম বিল্লাহ আল-মামুন
- বিশেষ প্রতিনিধি
ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল
- শিল্প-সম্পাদক
কাজী বাশীর আহমাদ
- বিতরণ সম্পাদক
আহসান উল্লাহ মাহমুদ

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

প্রথম বর্ষ, প্রত্নুতি সংখ্যা



প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও
যেকোন প্রয়োজনে
alburqan2015@gmail.com

সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক আল-বুরকান প্রেস আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

বিন্যাস-সূচি

দারসুল কুরআন

শাইখুল হাদীস মুফতি আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা /০৩

দারসুল হাদীস

শাইখুল হাদীস মুফতি আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা /০৪

সম্পাদকীয়

যুলুম সইবার দিন শেষ: এবার বদলা নেবার পালা /০৫

দিকনির্দেশনা

যেন অপরাধী লোকদের পথরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী /০৭

বিশুদ্ধ জ্ঞান

আমাদের লাঞ্ছনার কারণ: দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা

শাইখ নাসির ইবনু হাম্মাদ আল-ফাহাদ /১০

দায়িত্ববোধের সুরণ

নাহি আনিল মুনকার বর্জনের পরিণাম মনে আছে তো?

আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ সুলাইমান মিকদাদ /১৩

অর্থনীতি

অর্থনীতিতে আল-কুরআনের তত্ত্ব মেনে নেয়াটাই ঈমান, যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার দাবি

শাইখ শূয়াইব মাহমুদ আত-তাইমী /১৬

বিশ্লেষণ

জামাআত ও ইতাআত

ড. নাসরুল্লাহ মানসূর /১৮

বিশেষ প্রতিবেদন

ইহুদি সম্প্রদায়: অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী

ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল /২১

সমকালীন

শাবান মাসে যা করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ আবুল হাসনাত মুহাম্মাদ সালিহ /২৩

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প

শাইখ মাযহারুল ইসলাম /২৭

পরামর্শ

আপনার শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলবেন

মুহাম্মাদ তানভীর আহসান /২৯

মামলা তদবিরে বন্দীদের অভিভাবকগণ যা মনে রাখবেন

বুরকান ডেস্ক /৩১

মহিলাঙ্গন

নারী অধিকার: হে বোন! শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো কেবল উস্কানি আর প্রতারণা মাত্র

উম্মে সা'দ /৩৩

অমৃত ফলের আশায় বিষবৃক্ষ রোপণ

ফারিহা তাবাসসুম মীম /৩৫

ছড়া-কবিতা /৩৬

সংবাদ পরিক্রমা /৩৮

প্রশ্নোত্তর /৪৫



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবে, তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নিবে। কেউ তোমাদের সালাম দিলে তাকে বল না, তুমি মুমিন নও। তোমরা কি দুনিয়াবি সম্পদ কামনা কর? অথচ আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য প্রচুর গনীমত রয়েছে। তোমরাও এরকমই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই ভাল করে পরীক্ষা করে নিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ঐ বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন, যা তোমরা কর। (৪ নং সূরা আন-নিসা: ৯৪) উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস নিয়ে এসেছেন যে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَلَحَقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَيْ قَوْلِهِ {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} تِلْكَ الْغَنِيمَةُ قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এই আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু ছাগল ছিল। মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে তাদেরকে সালাম দিলো। মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো নিয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। দুনিয়াবি সম্পদ- আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগপাল। ইবনে আব্বাস (রা.) সালাম পড়েছেন।

(তাওহীদ প্রকাশনী খন্ড: ৪, পৃ. ৩৪৯, বুখারী: ৪৫৯১, মুসলিম: ৩০২৫, তিরমিযী: ৩০৩০, আবু দাউদ: ৩৯৭৪)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) তাফসীরে ইবনে জারীরে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে,

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير، عن ابن إسحاق، عن نافع: أن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمداً بن جاثمة مبعثاً، فلقاهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية، فرماه محمداً بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله، حتى تذوق نساؤه من الشكر ما ذاق نساؤي. فجاء محمداً بن جرير، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا غفر الله لك". فقام وهو يتلقى دموعه ببرد، فما مضت له ساعة حتى مات، ودفنوه، فلفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: "إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم" ثم طرحوه بين صدفى جبل وألقوا عليه الحجارة، ونزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا}

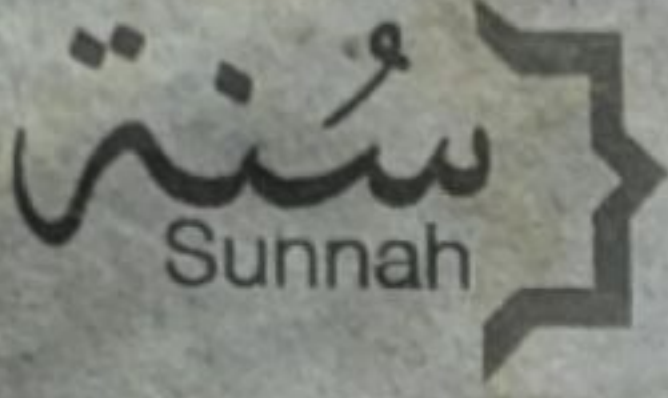
ইবনু উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুলহিম ইবনু জাসসামকে একটি বাহিনীর সাথে প্রেরণ করলেন। পথ চলতে চলতে রাস্তায় আমের ইবনু আসবাতের সাথে দেখা হল। আমের সালাম দিলো, কিন্তু জাহেলি যুগে শত্রুতার কারণে মুলহিম

তাকে তীর মেরে হত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমেরের লোকদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। তার পক্ষ হতে উয়াইনায়ে আকরা কথা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আজ সে খুশি হয়েছে, কাল দুঃখ ভোগ করবে। তখন উয়াইনা বলল- না, না। আল্লাহর কসম (তাকে ছাড়বো না) যে পর্যন্ত তার স্ত্রীদের উপর ঐ বিপদ পৌঁছবে, যে বিপদ আমাদের স্ত্রীদের উপর পৌঁছেছে। মুলহিম দু'টি চাদর পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বসলেন ক্ষমার জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চোখের পানি চাদর দ্বারা মুছতে মুছতে চলে যায়। সাত দিন যেতে না যেতেই সে মারা যায়। তাকে কবর দেয়া হলে যমীন তাকে বাইরে বের করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, তোমাদের এ খারাপ বন্ধুকে কিভাবে যমীন গ্রহণ করবে। আল্লাহ চান উপদেশ দিতে মুসলিমের সম্মানের ব্যাপারে। তারপর তার লাশ দুই পাহাড়ের মাঝে পাথর চাপা দেওয়া হয়। এ সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (ইবনু জারীর, সূরা নিসা: ৯৪, ইবনু কাসীর, সূরা নিসা: ৯৪)

*সুতরাং কোন মুসলিমকে তাকফির বা হত্যার ব্যাপারে সাবধান! আশা করি জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

রব্বুল আলামীন আমাদের ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউস রাখুন শেষ ঠিকানা। (আমীন)

-শাইখুল হাদীস মুফতি আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা



عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُذْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ
عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
رِقَابَ بَعْضٍ

আলী ইবনে মুদরিক (রহ.) বলেন, আমি
আবু জুরআ ইবনে আমর ইবনে জারির
(রহ.)-কে বলতে শুনেছি, তার দাদা
জারির (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের দিন
রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন,
লোকদের চুপ থাকতে বল। অতঃপর
তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা একে
অপরের গর্দান উড়িয়ে (হত্যা করে)
কুফরির দিকে ফিরে যেও না। (বুখারী,
তাওহীদ প্র. হাদীস নং ৭০৮০, ইবনে
মাজাহ: ৩৯৪২)

হাদীসের শিক্ষা

এক. কিয়ামাতের পূর্বে এক মুসলিম
অপর মুসলিমকে হত্যা করবে। অথচ
রাসূলুল্লাহর ভাষায় এটি সুস্পষ্ট কুফরি।
দুই. তাকফিরের ব্যাপারে খুব সাবধান!
আপনার ভুল ফতোয়ার কারণে যেন
কোন মুসলিমের হাত অপর মুসলিমের
রক্তে রঞ্জিত না হয়।

তিন. খুব গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে
যে, এটি কিন্তু বিদায় হজ্জের ভাষণ।
এরপরে কোন বিধান নাযিল হয়নি।
সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন।

কোন মুসলিমের হাতে অপর মুসলিম
হত্যা হলে বিষয়টি কতখানি ভয়ংকর
পরিণতি বয়ে আনবে আর এ ব্যাপারে
সাহাবাগণ কতখানি সতর্ক ছিলেন তা
নিম্নের হাদীস থেকেও অনুমান করা যায়।

তাছাড়া মুসলিমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব জড়িয়ে
পড়ার কারণে ইকামাতে দীনের মিশন ও
বহুল প্রতিক্ষীত ইসলামী খিলাফাহ
কতটুকু ভ্রমকির মুখে পড়বে তা
গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لِيَالِي
الْفَتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ
قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ
بَسَافَتِهِمَا فَكُلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ
فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ
قَتْلَ صَاحِبِهِ

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ফিতনার
রাতে (জামাল বা সিফফিনের যুদ্ধে) আমি
হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। অতঃপর আবু
বাকরা (রা.) আমার সামনে পড়লেন।
তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি
বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাত
ভাইকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তিনি
বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন
দু'জন মুসলিম একে অপরের সাথে যুদ্ধে
লিপ্ত হয় তাহলে উভয়ই জাহান্নামী।
তাকে বলা হল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী
কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি
বললেন, সেও তার বিপক্ষকে হত্যা
করতে চেয়েছিল। (বুখারী, তাওহীদ প্র.
হা: ৭০৮৩)

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَهُ يَبَايِعُ حُجْرَتِهِ

فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ
يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ
مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ
بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا
فِي قِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

যায়নাব বিনতে আবু সালমা (রহ.) বর্ণনা
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে
সালমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি
তার কক্ষের দরজায় ঝগড়া-বিবাদে শব্দ
শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের
কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আমি একজন
মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীর
আসে। হয়ত তোমাদের মাঝে অনেকেই
অন্যের তুলনায় কথায় পটু। আমি মনে
করি যে, সে সত্যবাদী। ফলে আমি তার
পক্ষে ফয়সালা করি। কিন্তু আমি যদি
কোন মুসলিমের হক অন্য কারো জন্য
ফয়সালা করি, তাহলে সেটা একখন্ড
আগুন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই
চাইলে তা গ্রহণ করুক অথবা তা ত্যাগ
করুক। (বুখারী, তাওহীদ প্র. হা: ৭১৮১,
আবু দাউদ, হা: ৩৫৮৩)

হাদীসের শিক্ষা

ক. উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,
রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মত একজন
মাটির মানুষ ছিলেন।

খ. তিনি কোন গায়েব জানতেন না।
গ. বিচারক দলিল, প্রমাণ ও সাক্ষীর উপর
ভিত্তি করে বিচার ফয়সালা করে থাকেন।
কিন্তু এমনও প্রকৃত হকদ্বার লোক বিচার
নিয়ে যান যাদের পক্ষে দলিল, প্রমাণ ও
সাক্ষী নেই এমনকি তিনি কথায়ও পটু
নন। কিন্তু বিপক্ষের লোক জানে যে,
তিনিই প্রকৃত পক্ষে হকদ্বার। তবুও মিথ্যা
দলিল, প্রমাণ ও সাক্ষী আর বাকপটুতার
মাধ্যমে বিচারের ফয়সালা নিজের পক্ষে
করিয়ে নেয়। মূলত সে নিজের জন্য
জাহান্নামের একটি অংশ নির্ধারণ করে
নেয়।

সুতরাং রব্বুল আলামীনকে ভয় করুন,
কেননা তিনি শাস্তি দানে বড়ই কঠোর।

-শাইখুল হাদীস মুফতি
আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা



যুলুম সইবার দিন শেষ এবার বদলা নেবার পালা

দিন বদলের মিছিলের সাথে ক্রমেই বাড়ছে আযাদিপ্রিয় জাতির মশালবাহীদের ভীড়। যামানার বুক চিড়ে বিশ্বের খিতায় খিতায় জেগে উঠছে শতবছর ধরে নির্যাতিত মুসলিমদের জিহাদি স্পৃহা। মাযলুম জাতির নওজোয়ানেরা খুঁজে ফিরছে নিজেদের হারানো ঐতিহ্য। দুনিয়া জুড়ে তাগুতি শক্তির সামনে সীনা টান করে দাঁড়াচ্ছে মুহাম্মাদি সিংহ শাবকেরা। গোটা ইসলামি বিশ্বে বয়ে যাচ্ছে বিপ্লবের ঝড়ো সমীরণ। উত্থাপ্ত হচ্ছে জিহাদের ময়দান। নওজোয়ানেরা সেজেগুজে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে জান্নাতি হুরদের দিকে। মায়েরা জোয়ান ছেলেদের কুরবানি দিচ্ছে আল্লাহর নামে। লেখা হচ্ছে বাহাদুরি আর বীরত্বের নতুন ইতিহাস। দিক-দিগন্ত থেকে পঙ্গপালের মতো রক্তের বদলা নিতে ছুটে চলছে আফগান, সিরিয়া, ইরাকসহ মাযলুম খিতাগুলোতে।

কিন্তু আমরা (বাংলাদেশি মুসলিমরা) দাজ্জালি গণতন্ত্রের নেকাব লাগানো দুনিয়ার সেরা ধোঁকাবাজদের সামনে দন্ডায়মান। গোলামির শৃঙ্খল আর পৈতাওয়ালা ব্রাহ্মণদের প্রতারণা আমাদের স্মরণশক্তির উপর বিছিয়ে দিয়েছে অচেতনতার চাদর। দিল্লির জামে মসজিদ, লাল কেতলা, কুতুব মিনার আর সোমনাথ মন্দিরের ইতিহাসও আজ আমাদের ঐতিহ্য মনে

করাতে পারছে না। বাবরি মসজিদ, গুজরাট আর শাপলা চত্বরের রক্ত আমাদের বুকে শেল হয়ে বিধছে না।

যে জাতির নারীদেরকে আমরা ইযযত দিয়েছি, সেই জাতি আজ ভরা বাজারে আমাদের ইযযতের নিলাম করে ফিরছে। অথচ আমরা দুই সিজদা আর গরু কুরবানির অনুমতির জন্য কেঁদে মরেও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছি বলেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। ভুলে গেছি দারুল হারব আর দারুল ইসলাম-এর মাসালা। অথচ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) হিন্দুস্তানকে সেই সময় দারুল হারব ফতোয়া দিয়েছিলেন, যখন দিল্লির মসনদে মুসলিম বসা ছিল। আদালতের আইন কানুন কাজীদের হাতেই ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সব ধরনের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। দুই ঈদ, জুমা এবং আযানের ব্যাপারেও কোনো আপত্তি ছিল না। সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাইয়িদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ এবং মাও. আব্দুল হাই (রহ.)-সহ উম্মাহুর কর্ণধার আলিম-উলামাগণ ছুটে গিয়েছিলেন বালাকোটের প্রান্তরে। বিশ্ববাসী দেখেছে, চাটাইয়ের উপর উপবিষ্ট জীর্ণশীর্ণ দেহ আর সম্মলহীন মোল্লা মৌলভীরা তোপ-কামান উঠিয়েছেন। নিজেদের ইলমের মান রাখতে ঘর-বাড়ি, বিবি-বাচ্চা, বড় বড় দীনি মজলিস সবকিছুকে আল-বিদা আল-বিদা বলে দিয়েছেন। কুরআন ও

আজ আমরা দীনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার বাহানা করছি। অথচ ইসলামের নিদর্শনগুলো হিফায়ত করা-ই দীনের সবচেয়ে বড় খেদমত। তার জন্য নিজের ঘর, নিজের মাদরাসা এমনকি নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে হলেও। বিবেককে প্রশ্ন করুন, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসের কি এতটুকু অনুভূতি ছিল না, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর ফতোয়া কতটুকু মুসিবত বয়ে আনবে? তাঁর কি জানা ছিল না, এই পদক্ষেপে হিন্দুস্থানের মাদরাসাগুলোর প্রত্যেকটা ইট ইংরেজরা খুলে নিবে?

হাদীসের দারস ছেড়ে কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান হিফায়ত করতে দাঁড়িয়ে গেছেন। ভুলে গেছেন কে শাইখুল হাদীস, কে শাইখুল তাফসীর, কে কুতুব আর কে আবদাল? নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহ তায়ালার মানশা পূর্ণ করতে ধূলোমলিন হয়েছেন। কাদায় লুটোপুটো খেয়েছেন। শুকনো বাসি রুটির উপর দিন কাটিয়েছেন। অসহনীয় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ভর্ৎসনাকারীদের ভর্ৎসনা সহ্য করেছেন। কুরআন হাদীস থেকে হিকমতে আমলি আর মাসলাহাতপছন্দির সবকদাতাদের জবাব দিয়েছেন। গাদ্দারি, অকৃতজ্ঞতা আর ঘর-বাড়ির বিচ্ছেদ সহ্য করে অবশেষে উম্মাহর এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাফেলা বালাকোটের ময়দানে নিজের শেষ সম্মল জানটুকুও রক্বে কায়েনাতে সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি দিয়েছেন।

আজ আমরা দীনের খেদমত আজ্জাম দেয়ার বাহানা করছি। অথচ ইসলামের নিদর্শনগুলো হিফায়ত করা-ই দীনের সবচেয়ে বড় খেদমত। তার জন্য নিজের ঘর, নিজের মাদরাসা এমনকি নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে হলেও। বিবেককে প্রশ্ন করুন, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসের কি এতটুকু অনুভূতি ছিল না, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার ফতোয়া কতটুকু মুসিবত বয়ে আনবে? তাঁর কি জানা ছিল না, এই পদক্ষেপে হিন্দুস্থানের মাদরাসাগুলোর প্রত্যেকটা ইট ইংরেজরা খুলে নিবে? কিন্তু তারপরও কোন ব্যথায় দিল্লিতে দীনের মহা খেদমত আজ্জামদাতা মাদরাসাগুলোকে দুশমনের তোপের নীচে রাখলেন? উম্মতের হীরকখন্ডগুলোকে একত্রিত করে কেন শহীদ করালেন? আমরা যখন আকাবিরের ইতিহাস অধ্যয়ন করি এবং বর্তমানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমাদের অন্তর সামনে সফরের পরিবর্তে অতীতের স্বর্ণালী অধ্যায়ের দিকেই ছুটে যেতে চায়।

আজ নিজেদেরকে প্রকৃতপক্ষেই পূর্ববর্তীদের মাপকাঠিতে পরখ করার সময় এসেছে। মুহাম্মাদি কষ্টি পাথরে

সময় খুবই সর্থক্ষিপ্ত।
আসুন অতীতকেই
ফিরিয়ে আনি। শাহ
আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে
দেহলভি (রহ.) যেসব
কারণে এই
উপমহাদেশকে দারুল
হারব ঘোষণা
করেছিলেন, সেগুলো
অধ্যয়ন করুন। বাংলা ও
হিন্দুস্তানের মুসলিমদের
উপর যুলুম-নির্যাতনের
চিত্রগুলো দেখুন।
দেয়ালে পিঠ ঠেকে
গেছে। এবার জেগে
উঠুন। জাগিয়ে তুলুন
চারপাশ। শরীক হয়ে
যান গুরাবাদের
কাফেলায়।

যাচাই করতে হবে, আমাদের এবং সালফে সালিহীনের পথ ও কর্মপদ্ধতিতে কতটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে? এই পার্থক্য কেবলই শাখাগত? নাকি বুনিয়াদিভাবেই আমরা দূরে সরে গেছি? কেবল কর্মপদ্ধতিতেই মতানৈক্য, নাকি উদ্দেশ্য-মিশন সবই উলট-পালট হয়ে গেছে? উদ্দেশ্য-মিশন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদেরকে কুরবানি করছি, নাকি নিজেদের জন্য উদ্দেশ্য এবং মিশন কুরবানি করা হচ্ছে? নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আশ্রয় বাকি আছে, নাকি বেঁচে থাকার তামান্না দীলে বাসা করে নিয়েছে? বালাকোটের প্রেরণা আর শামেলীর স্পৃহা আমার অন্তরকে উত্তপ্ত করে, নাকি লন্ডন-ওয়াশিংটনের নিমন্ত্রণ দীনি খেদমতের নতুন তাকায়া শিখিয়ে দিয়েছে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিবর্তে মাসলাহাত আর কল্যাণ জায়গা করে

নেয়ানি তো?

বাংলা ও হিন্দুস্তানি মুসলিম ভাইদেরকে একটা প্রশ্ন করতে মন চাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিমদের মতো আপনিও কি ইমাম মাহাদির অপেক্ষায় আছেন? যদি ইমাম মাহাদি এসেই পড়ে, তাহলে আপনি কি করবেন? দেশের সঙ্গ দিবেন, নাকি ইসলামের সঙ্গ দিবেন? ইমাম মাহাদির সাথে মিলে বাংলা ও ভারত দাঙ্গালি সেনাবাহিনীর মুকাবেলা করবেন, নাকি হেকমত আর মাসলাহাত সামনে নিয়ে ফায়সালা করবেন? ইমাম মাহাদির সাথে মিলেই যদি জিহাদ করেন, তবে সেই জিহাদের শুকুম এখনও আছে বাংলা ও হিন্দুস্তানের মুসলিমদের জন্য, নিজেদের আগামি প্রজন্মকে মুসলিম করে রাখার জন্য হিন্দুদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। অন্যথায় ধীরে ধীরে হিন্দুদের বিষ শিরায় শিরায় রক্ত হয়ে দৌড়াতে থাকবে। আপনি নিজের মুখে যতই দাবি করতে থাকুন যে, বাংলা ও হিন্দুস্তানে আপনার সব রকমের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, আপনাকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তানের বাইরে আপনার অপদস্থতা দেখে গোটা বিশ্ব আফসোস করছে। আপনার অধঃপতনের উপর ছাপা রিপোর্টগুলো পড়ে তো মনে হয়, ওরা যেন আপনাকে শূদ্র খাসি বানিয়ে দিয়েছে।

সময় খুবই সর্থক্ষিপ্ত। আসুন অতীতকেই ফিরিয়ে আনি। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) যেসব কারণে এই উপমহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলো অধ্যয়ন করুন। বাংলা ও হিন্দুস্তানের মুসলিমদের উপর যুলুম-নির্যাতনের চিত্রগুলো দেখুন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এবার জেগে উঠুন। জাগিয়ে তুলুন চারপাশ। শরীক হয়ে যান গুরাবাদের কাফেলায়। আওয়াজ তুলুন-

মায়লুম হওয়ার দিন শেষ,
এবার বদলা নেবার পালা...

وَكَذَلِكَ نَفْطِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمَجْرِمِينَ

এভাবেই আমি আয়াতসমূহ
বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি
যেন অপরাধী লোকদের পথরেখা
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী

আমি কতিপয় যুবক ভাইদের জানি। তারা প্রবল উদ্দীপনার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো, অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করল। জিহাদের ভূমিতে পৌঁছবেই এই ছিল তাদের মনের কামনা। তারা পথ চলতে শুরু করলো। কিন্তু পথে হঠাৎ তাগুতি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেল। তখন তারা তাদেরকে বন্দীকারী বাহিনীর সাথে এমন আচরণ করতে লাগল যেন সেই বাহিনীর লোকেরা মুসলমান! আমি বিস্ময় এবং বেদনায় হতবাক হয়ে গেলাম, যখন জানতে পারলাম যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাহিনীর লোকদেরকে মুসলমান ভেবে এই ভাইয়েরা তাদেরকে ধোঁকা দেয়নি, তাদের সাথে কোন মিথ্যা কথা বলেনি, বরং তাদের দেয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে নির্দিধায় বিশ্বাস করেছে।

এক.
যে বান্দা দীনের শত্রুদের মুকাবেলা করতে চায়, তাদের মিথ্যাকে নিজ হাতে ধ্বংস করে দিতে চায়, তার পক্ষে শত্রুদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা মোটেও শোভা পায় না। এমন বান্দার জন্যতো এই জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ- এই জ্ঞানের অভাবে এমনও হতে পারে যে, সে শত্রুদের চিনতে ভুল করছে, তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করছে। অথবা ভাবছে যে, এখনও তারা দীন থেকে বেরিয়ে যায়নি (অর্থাৎ এখনও তাদেরকে মুসলিম ভাবছে)। আমি কতিপয় যুবক ভাইদের জানি। তারা প্রবল উদ্দীপনার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো, অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করল। জিহাদের ভূমিতে পৌঁছবেই এই ছিল তাদের মনের কামনা। তারা পথ চলতে শুরু করলো। কিন্তু পথে হঠাৎ তাগুতী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেল। তখন তারা তাদেরকে বন্দীকারী বাহিনীর সাথে এমন আচরণ করতে লাগল যেন সেই বাহিনীর লোকেরা মুসলমান! আমি বিস্ময় এবং বেদনায় হতবাক হয়ে গেলাম, যখন জানতে পারলাম যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাহিনীর লোকদেরকে মুসলমান ভেবে এই ভাইয়েরা তাদেরকে ধোঁকা দেয়নি, তাদের সাথে কোন মিথ্যা কথা বলেনি, বরং তাদের দেয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে নির্দিধায় বিশ্বাস করেছে। মুসলিমদের সাথে দয়ালু ও সদাচারী হতে হবে ভেবে এই ভাইয়েরা সত্যবাদীর মত সবকিছু স্বীকার করেছে! কোন খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত বাদ রাখেনি, সবকিছু বলে

দিয়েছে! কিন্তু স্বীকার করার ফল হলো এই যে, নির্দয় অন্যায় আচরণ ও চরম অত্যাচার সহ্য করে এই ভাইদেরকে দীর্ঘ সময় যাবৎ কারাবন্দী থাকতে হলো। যালিমদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান না জানার কারণেই এমনটা হলো। বন্দীকারী লোকেরা যে তাদের কাফের প্রভুদের আনুগত্য করে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তা না দেখার কারণেই এমনটা হলো। তারা বোঝেনি যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীর এসব লোক মুসলিমদের সাথে ওয়াদা পালনের কোন ধার ধারে না, কোন সম্পর্কের সম্মানও করে না। তারা জানতো না যে, এ লোকগুলো মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! এদের কাজের ভিত্তিই হচ্ছে ধোঁকা, মিথ্যা আর ষড়যন্ত্র। দুই.
আমি এক ভাইকে জানি, তিনি কুরআনের হাফিজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহ্যক্ষমতার অধিকারী। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে মারধর, যুলুম-অত্যাচার, নিষ্ঠুর নির্যাতন, কী না করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, তার মুখ থেকে যেন এমন স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়, যার দ্বারা তাকে সুদীর্ঘ সাজা দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, তিনি এই সবকিছুর মাঝেও দৃঢ় ছিলেন, এতো অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও তিনি তাদের ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হননি। তো তাগুতি বাহিনী তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এবার একটা নতুন ফন্দি আঁটলো। গ্রেফতারের পূর্বে এই ভাই এক মসজিদে ইমামতি করতেন। এবার শত্রুরা তাকে এমন একজনের হাতে

তুলে দিলো, যে ব্যক্তি কিনা সেই মসজিদেরই একজন নিয়মিত মুসল্লি এবং খুবই পরহেযগার। লোকটি এসে নিজের পরিচয় দিয়ে ভাইটিকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, সে তার একজন নিয়মিত মুজাদি। এই লোক বহু রকম ওয়াদা কসম কেটে বলল, যদি স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, তবে সে নিজে তাকে সাহায্য করবে, এমনকি তাকে কোর্টেও যেতে হবে না। তো ভাইটি তার কথার উপর ভরসা করে এবারের প্রশ্নকর্তার কাছে সবকিছু অকপটে স্বীকার করে ফেললেন। এই দফায় তাকে একটা আঘাতও করা লাগলো না,

একদিন একটা বোমা খুঁজে পেলো। সে এটা তার বাড়িতে নিয়ে গেল। এরপর কোন এক সময়ে ভয়ংকর মূখের মতো সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে হবে একজন সচ্চরিত্র নাগরিক (তারা যেমনটা বলে থাকে!)। আর তাই সে পুলিশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলবে। সে অবশ্যই তাগুতের কর্মীদেরকে কাফের হিসেবে বিবেচনা করতো না। তাই সে তাদের কাছে গিয়ে বলল যে, সে জঙ্গলে একটা বোমায় হেঁচট খায়, আর পরে সে বোমাটি বাসায় নিয়ে যায়। সে তাদেরকে বলল, তারা যেন তার বাড়িতে এসে বোমাটি অপসারণ করে। পুলিশ

কাছে একটা বোমা আছে। ভাবখানা এমন যেন বোমাসহ ছেলেটাকে আবিষ্কার করে তারা সমাজকে এক আসন্ন বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে! ওদিকে এই মামলার উপর ভিত্তি করে সেই যুবকের হয়ে গেল সাত বছরের জেল!

চার.
আমি আরেক ভাইকে জানি, তিনি আরবে থাকতেন। ওখানকার দরবারি আলিমরা বরাবরই জ্ঞানপিপাসুদের তাকফির বিষয়ক বিধান নিয়ে পড়াশোনা করতে বাধা দেয়। তারা মানুষকে এ বিষয়ে একপ্রকার আতঙ্কিত করে রাখে। তাদের ভাষ্যমতে সরকার ও তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে তাকফির করার অর্থ দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। এটা তাকফিরীদের কাজ, খারিজীদের বৈশিষ্ট্য। এভাবে তারা যুবকদের ঈমানী চেতনাকে অবদমিত করতে চায় এবং অপরাধীদের সুস্পষ্ট পথরেখাকে অস্পষ্ট করে দিতে চায়, যেন তাদের চক্রান্ত বুঝে উঠা সাধারণ মানুষদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। এই ধরনের দরবারি আলিমদের দ্বারা প্রভাবিত কেউ যদি ইসলামের সাথে প্রতারণাকারী মুরতাদ সরকার গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে বা এই গোষ্ঠীকে রক্ষাকারী মুরতাদ বাহিনীর কোন লোককে নামায পড়তে দেখে, তাহলে এই অপরাধীকে সে কী মনে করতে পারে? আর যদি এই অপরাধীর কপালে নামাযের দাগ থাকে? হায়! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!!!

আমাদের এই আরবের অধিবাসী বন্ধু প্রবল উৎসাহে সিদ্ধান্ত নিলো, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, ইসরায়েলি ইহুদিদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। সে ইহুদি সীমানার নদীপথে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পাচার করলো। নিজেও অলৌকিকভাবে জর্দানি সৈন্যদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে সক্ষম হলো, কেউ কিছুই টের পেলো না। সে ঘুণাঙ্করেও জানতো না, এরা সবাই ইহুদিদের পাহারাদার বা তাদের গুপ্তচর। নতুবা সে কোনদিনও তাদেরকে বিশ্বাস করতো না বা তাদের উপর ভরসা করতো না।

নদী পার হবার পর সে খুব তৃষ্ণা বোধ করছিল। এমন সময় তার মনে পড়ল

ওখানকার দরবারি আলিমরা বরাবরই জ্ঞানপিপাসুদের তাকফির বিষয়ক বিধান নিয়ে পড়াশোনা করতে বাধা দেয়। তারা মানুষকে এ বিষয়ে একপ্রকার আতঙ্কিত করে রাখে। তাদের ভাষ্যমতে সরকার ও তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে তাকফির করার অর্থ দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। এটা তাকফিরীদের কাজ, খারিজীদের বৈশিষ্ট্য। এভাবে তারা যুবকদের ঈমানী চেতনাকে অবদমিত করতে চায় এবং অপরাধীদের সুস্পষ্ট পথরেখাকে অস্পষ্ট করে দিতে চায়, যেন তাদের চক্রান্ত বুঝে উঠা সাধারণ মানুষদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে।

তাকে অপেক্ষা করতে বলল, আর বলল বোমাটি সংগ্রহ করার জন্য তারা এক ঘন্টার মাঝেই পৌঁছে যাবে। সত্যি, তারা এক ঘন্টার আগেই ছেলেটির বাসায় পৌঁছে গেল! তবে তারা একা ছিল না, তাদের সাথে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, বিশেষ বাহিনী, ইন্টেলিজেন্স ফোর্স এবং অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ি। তারা ছেলেটির বাসা ঘিরে ফেলল। বাসায় ঢুকে তল্লাশি চালাল, সবকিছু তছনছ করে ফেলল, এরপর তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল, সেই বোমাসহ। তারা ছেলেটির বিরুদ্ধে অবৈধ বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার মামলা ঠুকে দিলো। কিন্তু মামলার কোথাও উল্লেখ করল না যে, সে নিজেই তাদেরকে বোমার কথা বলেছিল এবং সে নিজেই তাদেরকে বোমা সরানোর অনুরোধ করেছিল! উল্টো তারা লিখলো যে, ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট এবং পুলিশরা তাদের অভিজ্ঞ, দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে, এই ছেলের

আর কী সহজেই না তার স্বীকারোক্তি মিলে গেল! অথচ কত ভয়ানক নির্যাতনের মুখেও এই ভাই অবিচল ছিল, যা খুব অল্প লোকই সহ্য করতে পারে। আর এই ভাইয়ের কী হলো? তাদেরকে বিশ্বাস করার ফলে, তাদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করার বিনিময়ে তাকে পেতে হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অবশ্যই এই ভাই এর আগে এই যালিমদেরকে কাফের হিসেবে গণ্য করতেন না। তিনি যালিমদের সঠিক বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন না। প্রশ্নকর্তার নামাযি ব্যক্তিত্ব তার কাছে অনেক গুরুত্ব বহন করতো। কিন্তু এই চরম ভুলের কুফল তাকে আজো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। দশ বছর যাবৎ তিনি তাগুতের কারাগারে পড়ে আছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে মুক্ত করুন। আমীন।

তিন.
আমি এক যুবককে জানি, সে জঙ্গলে

যে, সে পানি আনতে ভুলে গেছে। তাই সরল মনে সে ফিরে গেল এদের মাঝে এক সৈনিকের কাছে থেকে পানি সংগ্রহ করতে। ওখানে পৌঁছানোর পর সেই সৈন্যকে নামাযরত দেখেতো সে আরো স্বস্তি বোধ করলো, তার ব্যাপারে কোন সন্দেহই মনে আসলো না। নামায পড়া শেষ হলে সেই সৈন্য আমাদের এই বন্ধুকে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলে, সে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, সে এখানে কী করছে। আমাদের এই বন্ধুও সরল মনে সৈন্যর কাছে তার মনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলো আর পানি চাইলো। সৈনিকটি তাকে পানি দিলো এবং আন্তরিকতার সাথে তার বন্দুকটা একটু দেখতে চাইলো। আমি এখানে এক মুহূর্তের জন্য থামতে চাই। আর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই আবু বাসির (রা.)-এর কথা। ঈমানদারদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কথা। স্মরণ করে দেখুন, আবু বাসির (রা.) কী চাতুর্যতার সাথে তার বন্দীকারীকে বলেছিল যে, সে তার তরবারিটা দেখতে চায়। অতঃপর সে ঐ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুর ক্ষেত্রে কী হলো? সে নিজেই বোকামি মতো প্রতিপক্ষের সৈন্যের হাতে নিজের অস্ত্র তুলে দিলো, তাকে বিশ্বাস করলো! আর ফলস্বরূপ তাকে ভোগ করতে হলো এক নিদারুণ পরিণতি।

সেই তাগুতি সৈন্য তৎক্ষণাৎ বন্দুক পরখ করার কথা বলে ফাঁকাগুলি ছুঁড়তে লাগলো। আসলে সে তার উর্ধ্বতন সৈনিকদের সংকেত দিচ্ছিলো। সংকেত পেয়ে তারা ওখানে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাইকে গ্রেফতার করলো, তাকে ধরে আদালতে নিয়ে গেল। তার হয়ে গেল সাত বছরের জেল!

সারংশ

হে আমার ভাইয়েরা, আমি আব্দুল্লাহর কসম করে বলছি, এই সবগুলো ঘটনা সত্য। এরা সবাই এখন আমার দেশের বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়, বরং আমাদের চারপাশে এমন আরো বহু ঘটনা ঘটে চলছে। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হলো, উপরের ঘটনাগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই

যারা দীন-ইসলামের সাথে প্রতারণা করে নিজের দীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাগুত মুর্তাদ সরকারের দাসে পরিণত হয়েছে, সেই সকল অপরাধী মুর্তাদ লোকদের কাছে তুচ্ছ কিছু পার্থিব লাভ অর্জনই পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তার জন্য যে পথই নিতে হোক না কেন তারা সেটার পরোয়া করে না। হোক তা অসম্মানজনক পথ, কিংবা সম্মানজনক পথ। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, এর ফলে আজ জিহাদে ব্যাঘাত ঘটানো, মুজাহিদ্দীনদের বাধা দেয়া, আর জালেমদের রাজত্বকে নিরাপত্তা দান করাই তাদের পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের শত্রুদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করা হয়েছে। অপরাধীদের সুস্পষ্ট পথরেখা সম্পর্কে ধারণার অভাব, জিহাদ ও মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে তাদের কর্মপদ্ধতি না জানা এবং দীনের শত্রুদের প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাপারটিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি না করার কারণেই তাদের উপর এই নির্মম পরিণতি নেমে এসেছে।

যারা দীন-ইসলামের সাথে প্রতারণা করে নিজের দীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাগুত মুর্তাদ সরকারের দাসে পরিণত হয়েছে, সেই সকল অপরাধী মুর্তাদ লোকদের কাছে তুচ্ছ কিছু পার্থিব লাভ অর্জনই পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তার জন্য যে পথই নিতে হোক না কেন তারা সেটার পরোয়া করে না। হোক তা অসম্মানজনক পথ, কিংবা সম্মানজনক পথ। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, এর ফলে আজ জিহাদে ব্যাঘাত ঘটানো, মুজাহিদ্দীনদের বাধা দেয়া, আর জালেমদের রাজত্বকে নিরাপত্তা দান করাই তাদের পরম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এই অপরাধী গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতির মূল ভিত্তিই হলো, মিথ্যা

কথা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর তাদের পথরেখা পঠিত হয় প্রতারণা, কপটতা ও ছলনার সমন্বয়ে। তাদের ব্যাপারে বন্দুল আলামীন কতই না সুন্দর বোঝা দিয়েছেন—

অর্থাৎ তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না এবং অসীকারেরও না। আর তারাই হলো সীমানলঙ্ঘনকারী। (সূরা তাওবা: ১০)

তারা চায় যে, তারা যেমন কুফরি করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরি করো; যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাটকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আব্দুল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিনুত হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো। তাদের মধ্য থেকে কাটকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (সূরা নিসা: ৮৯)

আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাকৃতি আপনার নিকট প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি সাধুত্ব তাদের কথা শ্রবণ করে থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠ সদৃশ। তারা যে কোন উচ্চ আওয়াজকেই নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আব্দুল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে? (সূরা মুনাফিকুন: ৪)

যে এসব বিষয় সম্পর্কে জানেনা, এসব ব্যাপারে সচেতন নয় এবং এই ঘৃণ্য অপরাধীদের সম্পর্কে যার সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, সে জেনে রাখুক— জিহাদ তার বোকামি ও ছেলেমানুষি চায় না, ঠিক যেমন জিহাদ চায় না আরো ব্যর্থতা ও পরাজয়ের বোঝা বহিতে।

(শাইখের “জিহাদ থেকে প্রাপ্ত সুফলসমূহ” শীর্ষক রিসালাহ-র অংশবিশেষ।
আব্দুল্লাহ তাঁকে তাগুতের কারাগার থেকে মুক্ত করুন)

আমাদের লাঞ্চার কারণ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা



■ শাইখ নাসির ইবনু হাম্মাদ আল-ফাহাদ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শীঘ্রই কুফরি শক্তি তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য একে অপরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তখন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম হবো? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত। কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), ওয়াহান কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং কিতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম)-কে অপছন্দ করা। (মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ১৪, হাদীস নাম্বার- ৮৭১৩। ইমাম হাইসামী বলেছেন, হাদীসটির সনদ সুন্দর, শূয়াইব আরনাউতের মতে হাসান লি গাইরিহি)

সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ, হাদীসটি হাসান)

এই হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, আসলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে

অল্লাহকে অনেক কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্য রয়েছে, অথচ এর মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, তাদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধান নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

প্রথমত: তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য লোকজন একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেভাবে খাবারের জন্য আহ্বান করা হয়।

সত্যিই আজ মুসলিম উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে দলে দলে বিভক্ত। এই অবস্থায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতি, মুসলিম উম্মাহর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং একে অন্যকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। যেমন: সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ইত্যাদি- সেটা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হোক অথবা খনিজ সম্পদ দখলের জন্য হোক অথবা অর্থনৈতিক বাজার দখল করার জন্য হোক- কেউ আক্রমণ করছে সরাসরি আত্মসী বাহিনী পাঠিয়ে, কেউবা কূটনীতি (Diplomacy)-র মাধ্যমে, কেউবা

আদর্শিকভাবে (Ideologically), কেউবা সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কেউবা তাদের

আবিষ্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা রপ্তানী করে তাদের মানসিক দাস তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর এক্ষেত্রে তারা গণতন্ত্র রক্ষা, মানবতা, নারী-মুক্তি, শিশু-অধিকার, সবার জন্য শিক্ষা, সামাজিক-উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের মোড়কে তাদের কার্যক্রমকে ঢেকে নিয়েছে। বস্তুত: ইসলামি খিলাফাত ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উপর এই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত। এটা সুস্পষ্ট ব্যাপার। যারাই কুরআনুল হাকীমে বর্ণিত আনআম (গবাদি পশু)-এর মতো নয়, তারাই জানেন ও বুঝেন।

দ্বিতীয়ত: তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা তখন সংখ্যায় হবে অগণিত।

এখান থেকে বুঝা যায়, বেশি সংখ্যক হওয়া ইসলামের কোন Demand নয়। ইসলাম চায় Quality, সংখ্যাচিন্তা এখানে গৌণ। রব্বুল আলামীন চেয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম? (আমিলুন সালিহান), এটা চাননি যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে বেশি? (আমিলুন কাসিরান)। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল মুসলিমদের তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে কাফিররা ছিল মুসলিমদের তুলনায় ৭০ গুণ। উভয় যুদ্ধেই মুসলিমরা বিজয়ী হয়। অপরদিকে হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কাফিরদের চেয়ে বেশি। কিন্তু সে যুদ্ধে তারা পরাজয়ের দাঁড় গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে রব্বুল আলামীনের রহমতে বিজয় আসে। আফসোস বর্তমান মুসলিম উম্মাহ তাদের সংখ্যাধিক্যের Statistics নিয়ে ব্যস্ত, কোন ধর্ম সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়ে চলছে, কোন দেশে মুসলিম Growth rate কত? ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তারা ব্যস্ত। কিন্তু মুসলিমদের Quality নিয়ে কোন চিন্তা হচ্ছে না। অথচ রব্বুল আলামীন কুরআনুল হাকীমে বারংবার বলেছেন, বিজয় শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসে, আর তাঁর বিজয় দানের ওয়াদা শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই। রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

كَيْمٌ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ বৃহৎ দলের উপর বিজয় লাভ করেছে! (২ নং সূরা বাকারা: ২৪৯)

তৃতীয়ত: তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনারশির মতো, যা সহজেই স্রোতে ভেসে যায়।

এটা হচ্ছে বেশি সংখ্যক হওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহর এই অবস্থার বর্ণনা। সাগরের ফেনার যেমন নিজস্ব কোন শক্তি নেই, শুধু উপর থেকে দেখতে অনেক মনে হয়, অথচ তার চালিকা শক্তি হলো নিচের পানির স্রোত; যা তাকে যেকোন ইচ্ছা সেদিকেই নিয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহও বর্তমানে সংখ্যায় অধিক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তাদের প্রতিটি দেশই সুদভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত, কুরআন সূন্যাহ বিবর্জিত পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদী, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের দেশগুলো পরিচালিত হচ্ছে। আর ইসলামের গন্ডি শুধুমাত্র মসজিদ ও কতিপয় ব্যক্তিগত নিষ্পাণ নিয়ম-কানূনের মধ্যে সীমাবদ্ধ! এ যেন সংখ্যায় বেশি হয়েও তারা Minority. কাফের-মুশরিক ইসলামের শত্রুরা ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে; কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একটি কথাও বলতে পারে না। অথচ মুসলিম উম্মাহ সমুদ্রের ফেনারশির মতোই সংখ্যাধিক্য নিয়ে আনন্দিত, উল্লসিত ও গর্বিত।

চতুর্থত: আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মধ্যে ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন।

এখান থেকে দু'টি বিষয় প্রতীয়মান হয়-ক. মুসলিমদের শত্রু আছে, মিত্র আছে। ইসলাম কোন বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়, কিংবা অহিংসা পরমধর্ম প্রকৃতির গৌতমীয় বাণীতে বিশ্বাস করে না। বরং ইসলামে ভালবাসা ও ঘৃণা (আল-ওয়ালা ওয়াল বারাতা) একটি গুরুত্বপূর্ণ

Concept। অনেক Modernist এবং Self-defeatist মুসলিম যাদের মন-মগজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, ডিস, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে সঠিক ইসলামের শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে, তারা যতই এ ব্যাপারটায় তাদের বিদেশি বন্ধুদের কাছে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েন না কেন। আল্লাহর রহমত, তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অবিকৃত রেখেছেন। না হলে এরা ইসলামকে বিকৃত করে কোথায় যে নিয়ে যেতো, তা কল্পনাও করা যায় না! রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৫ নং সূরা-মায়িদা: ৫১) মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে, বিজাতীয় প্রভুদেরকে বন্ধু অভিভাবক করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

খ. মুসলিমদের উচিত তাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা। আর তাদের অন্তরে আমাদের ভয় থাকাটাই Normal scenario. যদি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কোন সমস্যা আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের দূরবস্থার একটি কারণ হিসেবে তাদের মনে আমাদের ভয় না থাকাকে উল্লেখ্য করেছেন। আর রব্বুল আলামীন তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণাই দিয়েছেন, যা বেশির ভাগ মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী তাদের কুচকাওয়াজে না বুঝে মন্ত্রের মতো পাঠ করে থাকে-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শীঘ্রই কুফরি শক্তি তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য একে অপরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তখন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম হবো? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত। কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), ওয়াহান কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং কিতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম)-কে অপছন্দ করা।

আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে। যদ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুদেরকে। আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কখনো যুলুম করা হবে না। (৮ নং সূরা আনফাল: ৬০)

তাই কাফিরদের মনে ভয়-ত্রাস সৃষ্টি করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরয। কে আছে এমন যে আল্লাহর এই হুকুমকে অস্বীকার করতে পারে? আর এক্ষেত্রে মুসলিমরা শুধু চোরের কাছে পুলিশ যে রকম ত্রাস সৃষ্টি করে, সে রকম ত্রাস সৃষ্টিকারী নয়, বরং সুলাইমান (আ.) যেভাবে কোন প্রকার ভয়, Problem ছাড়াই বিলকিসের রাজত্বে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন সে রকম ত্রাস সৃষ্টিকারী।

এটা ছিল আমাদের প্রথম সমস্যা, আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের মাঝে ওয়াহান ঢুকিয়ে দিবেন।

পঞ্চমত: জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), ওয়াহান কী? তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা অথবা মৃত্যুকে অপছন্দ করা।



আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা, ওয়াহান হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা। কিতাল ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা। আর এটা হবে, তখনই যখন আমরা জান্নাত-জাহান্নাম থেকে চোখ ফিরিয়ে দুনিয়ার দিকে মনযোগ দিবো। অনেক ইসলামপন্থীদের জন্য, আল্লাহর উপর ভরসা হারিয়ে কিংবা নিজের কৌশল, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির উপর অত্যাধিক ভরসা করতে দিয়ে আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করা, সুন্নাহর বিরোধিতা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে Apparently ইসলামের Basic দাওয়াত, শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া, হেকমত, পরিস্থিতির প্রয়োজন কিংবা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ইত্যাদি শব্দের আড়ালে। এসবই ওয়াহানের ফসল। আর বাকি যারা আছেন তাদের ব্যাপারে রব্বুল আলামীনের ঘোষণা—

তুমি কি তাকে দেখ না, যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? এর পরেও কি তুমি তার কাজের যিম্মাদার হতে চাও? (২৫ নং সূরা ফুরকান: ৪৩)

উপরে বর্ণিত নফসের দাস এবং গবাদি-পশুর মতো লোকজন; তাদের ব্যাপারতো বলাই বাহুল্য। আসলেই, তাদের শৈশব, কৈশোরে, পড়ালেখা করে চাকরি নেওয়া, টাকা আয় করে পরিবারের ভরণ-পোষণ করা, বিয়ে করে

পরবর্তী বংশধর উৎপাদন করা, বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার মধ্যে গবাদি-পশুর সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়। গবাদি পশুর মতোই, এই দুনিয়ায় তাদের Ultimate লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, জান্নাত-জাহান্নাম এসব কিছুই তাদেরকে এক চুলও নড়াতে পারে না বরং তাদের TV সিরিয়াল কিংবা অফিসের বসের মনের ইচ্ছা বহুগুণ বেশি Move করায়। টাকা আয়, খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-শাদি, মৃত্যু ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন চাওয়া-পাওয়া, ভালবাসা, Aim, Vision নেই। অথচ তারা মুসলিম! আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে এই গবাদি-পশুর আজাব থেকে রক্ষা করুন।

আর মৃত্যুকে ভয় মানুষ তখনই পায়, যখন তার জন্য প্রস্তুতি কম থাকে। আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি কম থাকা মানেই মুসলিম হিসেবে আমরা আমাদের করণীয়গুলো যথাযথভাবে করছি না, হয়তো আমরা ইসলামের কিছু কিছু নিয়ম-কানুন, রেওয়াজ-রসুমাত পালন করি, কিন্তু নিজের জীবনে ইসলামকে ধারণ করিনি, ইসলাম আমাদের জীবনের Mission ও Vision হয়ে উঠেনি— যা মুসলিম মাত্রই হওয়ার কথা ছিলো। রব্বুল আলামীন এ ব্যাপারটিই কুরআনুল হাকীমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তোলে ধরেছেন—

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিষ্কিপ্ত হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন। (২ নং সূরা আল-বাকার: ৮৫)

যখন থেকে আমরা মৃত্যুকে মনে করবো— তা আমাদের আসল ঘর জান্নাতের প্রবেশদ্বার, যখন থেকে আমরা এই দুনিয়াকে নিজের জন্য জেলখানা মনে করবো, কিংবা মনে করবো কোন Transit camp— যেখানে শুধুমাত্র অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি, কিংবা

যখন থেকে আমরা আল্লাহর রাস্তায় কিতালকে আমাদের লাঞ্ছনা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে জানবো, তখন আমরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠত: উপরোক্ত দুটি সমস্যার সমাধান, এমন কি মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীসের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—

যখন মানুষ দিনার এবং দিরহামের মধ্যে ডুবে যাবে, যখন ঈনা নামক (সুদী) ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাবে, আর গরুর লেজ ধরেই সমুপ্ত হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের দীনে (জিহাদ-কিতালে) ফিরে যাবে। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ— ২/২৮, তাবারানী— ১২/৪৩৩, বায়হাকী— শূয়াবুল ঈমান ৭/৪৩৪, আবু ইয়ালা— ১০/২৯, আবু নুয়ঈম— ১/৩১৩)

তাই আমাদের সমস্যা কোন টাকা-পয়সার, Technology, Business-এর কমতি নয়, গরুর লেজ অর্থাৎ Agriculture-এর কমতি নয়, যা অনেক তথাকথিত ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা মনে করে থাকেন। বরং আমাদের সমস্যা অন্য কোথাও। আমাদের লাঞ্ছনার কারণ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়া, কিতাল করতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুকে ভয় করা আর দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে বেশি ভালবাসা। আর সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে, পরিপূর্ণভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের দিকে তথা আল্লাহর দীনে ফেরত আসা।

হে আল্লাহ! আমাদের মন থেকে ওয়াহান দূর করে দিন এবং আমাদের শত্রুদের মনে আমাদের ভয় সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে আপনার দীন ইসলামে— যা একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা, একমাত্র গ্রহণযোগ্য Ideology, একমাত্র গ্রহণযোগ্য আইন-বিধান, শিক্ষা ও আদর্শ, তাহজীব তামাদুন-এ পরিপূর্ণভাবে ফিরে যাওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

হে জাতির আলিমগণ! নাহী আনিল মুনকার বর্জনের পরিণাম মনে আছে তো?



■ আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ সুলাইমান মিকদাদ

“

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন
যে, আলিম-উলামাদের
ধমকের জন্য এর চেয়ে
বেশি কঠিন আয়াত
কুরআনুল হাকীমে আর
একটিও নেই। একদা
আলী (রা.) এক খুৎবায়
রব্বুল আলামীনের হামদ ও
সানা বর্ণনা করার পর
বলেন- হে লোক সকল!
তোমাদের পূর্ববর্তী
লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস
হয়ে গেছে যে, তারা
অসৎকার্যে লিপ্ত থাকতো।

অথচ তাদের
আলিম-উলামারা
সম্পূর্ণরূপে চুপ থাকতো।
যখন এটা তাদের অভ্যাসে
পরিণত হলো তখন রব্বুল
আলামীন তাদের উপর
বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি
অবতীর্ণ করলেন।

”

রব্বুল আলামীনের ভাষায়-

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّخْتِ لِبَنَسٍ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ
عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّخْتِ لِبَنَسٍ
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

অর্থাৎ তুমি তাদের মধ্যে এমন লোক
অনেক পাবে, যারা পাপ, সীমালঙ্ঘন ও
হারাম (সুদ-ঘুষ) ভক্ষণে তৎপর, তাদের
এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবশ্যই নিকৃষ্ট। কিন্তু
আলিম-উলামাগণ ঐ সব লোকদেরকে
পাপের কথায় এবং হারাম ভক্ষণে কেন
বাধা দেয় না? (বাধা না দিয়ে চুপ থাকার)
এ ভূমিকাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (সূরা
মায়িদা: ৬২-৬৩)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে,
আলিম-উলামাদের ধমকের জন্য এর
চেয়ে বেশি কঠিন আয়াত কুরআনুল
হাকীমে আর একটিও নেই। একদা আলী
(রা.) এক খুৎবায় রব্বুল আলামীনের
হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন-
হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী
লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে
যে, তারা অসৎকার্যে লিপ্ত থাকতো।
অথচ তাদের আলিম-উলামারা
সম্পূর্ণরূপে চুপ থাকতো। যখন এটা
তাদের অভ্যাসে পরিণত হলো তখন
রব্বুল আলামীন তাদের উপর বিভিন্ন
প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি
অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তি তোমাদের
উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের

উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা
এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা। বিশ্বাস
রেখো যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ
কাজে বাধা প্রদানে তোমাদের না রিয়ক
বা খাদ্য কমাবে, না তোমাদের মৃত্যু
নিকটবর্তী করবে। (ইবনে কাসীর)

আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহতে এসেছে,
জাবির (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ
(সা.)-কে বলতে শুনেছি- যে জাতির
মধ্যে কোন লোক আল্লাহর অবাধ্যতার
কাজ করে এবং ঐ জাতির লোকগুলো
বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ
কাজ থেকে বিরত না করে, তাহলে
আল্লাহ সবার উপরই তাদের মৃত্যুর
পূর্বেই স্বীয় আযাব নাযিল করবেন।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ
(সা.) বলেন, বনী ইসরায়েলের মধ্যে
প্রথম যখন পাপাচারের প্রসার শুরু হয়
তখন তাদের আলিমরা তাদেরকে বাধা
দেয়। কিন্তু যখন দেখে যে, পাপাচারীরা
তাদের কথা মানে না, তখন তারা
তাদেরকে পৃথক না করে তাদের সাথেই
উঠাবসা, পানাহার করতে থাকে। আল্লাহ
তখন একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ
সৃষ্টি করে দেন এবং দাউদ ও ঈসা
(আ.)-এর বদ দু'আর মাধ্যমে তাদের
উপর লানত বর্ষণ করেন। কেননা, তারা
অবাধ্য ও অত্যাচারী ছিল। বর্ণনা করার
সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বালিশে হেলান
দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু একথা বলার পর
সোজা হয়ে বসে বললেন- না, না,
আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমাদের
কর্তব্য হচ্ছে, তোমরা জনগণকে শরীয়ত

বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বাধা দিবে এবং এবং তাদেরকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়ে নেবে।

সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, বনী ইসরায়েলের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বদভ্যাস ঢুকেছিল যে, কোন লোক অপর কোন লোককে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখলে তাকে বাধা প্রদান করতো। তাকে সে বলতো, আল্লাহকে ভয় কর এবং খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর, এটা হারাম। কিন্তু পরদিন যখন সে তা ছাড়তো না তখন সে তার থেকে পৃথক হয়ে যেতো না। বরং একই সাথে পানাহার করতো এবং উঠাবসা করতো। এ কারণে সবার অন্তরেই সংকীর্ণতা এসে যায়। এরপর তিনি সূরা মায়েদার এ আয়াত পাঠ করেন, বনী ইসরায়েলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লানত করা হয়েছিল দাউদ ও ইসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লানত এ কারণে করা হয়েছিল, তারা আদেশের বিরোধিতা করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা একে অন্যকে অন্যায় কাজে বাঁধা দিত না; তাদের এ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (সূরা মায়েদা: ৭৮-৭৯)

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের উপর ফরয হচ্ছে, তোমরা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে এবং তাকে হকের উপর আসতে বাধ্য করবে। আবু দাউদের হাদীসে অতিরিক্ত আছে, তোমরা যদি এটা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরও একে অপরের সাথে মেরে দিবেন এবং তোমাদের উপর তার আযাব নাযিল করবেন, যেমন এদের (বনী ইসরায়েলের) উপর অবতীর্ণ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর নিজ হাতে শাস্তি পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করতে থাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের দুআ কবুল করবেন না।

ইবনে মাজাহতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ

আমরা সৎ কাজের আদেশ যৎসামান্য দিলেও অসৎ-অন্যায় থেকে কিন্তু মোটেও বাধা দিচ্ছি না। যেমন ধরুন- আমরা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান, সদকা ইত্যাদির জন্য উপদেশ দিচ্ছি, কিন্তু চোখের সামনে মদ-জুয়া, লটারি, নাচ-গান, উলঙ্গ-বেহায়াপনা, সুদ-ঘুষ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন, পতিতালয়ের লাইসেন্স প্রদান, আল্লাহর আইন পরিবর্তন, বৃটিশদের রেখে যাওয়া তাগুতি-কুফরি সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী অসংখ্য আইন রচনা, কুরআনুল হাকীমের হুকুম এ যুগে অচল বলে ঘোষণা, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে সার্বভৌমত্বের মালিক বানিয়ে দেয়া.... ইত্যাদি অসংখ্য অন্যায়-অপরাধ চোখের সামনে হতে দেখেও আমরা এ থেকে এর কর্তাদেরকে বাধা দিচ্ছি না। এখন আমরা মসজিদে মসজিদে, খানকায় খানকায় শেষরাতে আরামের ঘুম হারাম করে পর্যন্ত এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করছি, কিন্তু রব্বুল আলামীন তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের দুআ কবুল করছেন না।

(সা.) বলেন, তোমরা ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দিতে থাক এমন সময় আসার পূর্বে যে, তোমরা দুআ করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না। অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বাধা না দিলে, অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন আমরা আল্লাহর কাছে অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দুআ করবো ঠিক কিন্তু আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করবেন না। আমাদের অবস্থা দেখুন- আমরা সৎ কাজের আদেশ যৎসামান্য দিলেও অসৎ-অন্যায় থেকে কিন্তু মোটেও বাধা দিচ্ছি না। যেমন ধরুন- আমরা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান, সদকা ইত্যাদির জন্য উপদেশ দিচ্ছি, কিন্তু চোখের সামনে মদ-জুয়া, লটারি, নাচ-গান, উলঙ্গ-বেহায়াপনা, সুদ-ঘুষ,

রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন, পতিতালয়ের লাইসেন্স প্রদান, আল্লাহর আইন পরিবর্তন, বৃটিশদের রেখে যাওয়া তাগুতি-কুফরি সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী অসংখ্য আইন রচনা, কুরআনুল হাকীমের হুকুম এ যুগে অচল বলে ঘোষণা, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে সার্বভৌমত্বের মালিক বানিয়ে দেয়া.... ইত্যাদি অসংখ্য অন্যায়-অপরাধ চোখের সামনে হতে দেখেও আমরা এ থেকে এর কর্তাদেরকে বাধা দিচ্ছি না। এখন আমরা মসজিদে মসজিদে, খানকায় খানকায় শেষরাতে আরামের ঘুম হারাম করে পর্যন্ত এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করছি, কিন্তু রব্বুল আলামীন তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের দুআ কবুল করছেন না।

ইমাম বুখারী এতদসংশ্লিষ্ট পর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষ্য তুলে ধরেন- অন্যায়কারী এবং যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ে বাধা দেয় না এ উভয় দলের পরিণামের দৃষ্টান্ত হল, ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজের দু'দল যাত্রীর ন্যায়, যাদের একদল ছিল জাহাজের উপর তলায় এবং অন্যদল ছিল নীচের তলায়। নীচের তলা চারদিক হতে আবদ্ধ থাকায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় পানি আনতে উপরে যেতে হয়। এমতাবস্থায়, উপর তলার যাত্রীদের বিরক্তি ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণে নীচ তলার যাত্রীরা সরাসরি পানি তুলতে জাহাজের তলায় গর্ত করতে লাগল; কিন্তু উপর তলার যাত্রীরা বাধা দিল না। অতঃপর দু'দল যাত্রীই ডুবে মারা গেল।

এবার কুরআনুল হাকীমে বর্ণিত রব্বুল আলামীনের একটি উপমা গভীরভাবে লক্ষ্য করুন-

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةُ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

যখন জনপদের একটি অংশ বলল, হে অন্যায় থেকে বাধা দানকারীরা! তোমরা

কেন ঐ জাতিকে অন্যায় থেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছ? আল্লাহই তো তাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন। অন্যায় থেকে বাধা দানকারীরা বলল, এটা আমাদের দায়িত্ব, আল্লাহর নিকট দায়মুক্তির জন্য এবং তাদেরকে (অন্যায়কারীদের) সাবধান করার জন্য। তারপরও যখন তারা উপদেশ গ্রহণ করল না, তখন আমি কেবল তাদেরকেই উদ্ধার করলাম যারা অন্যায়ে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যদের তথা যালিমদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, কারণ তারা ছিল পাপাচারী। (সূরা আরাফ: ১৬৪-১৬৫)
এটা ছিল বনী ইসরায়েলের ঘটনা। উক্ত ঘটনায় ৩টি দল হয়েছিল। তন্মধ্যে, প্রথম দলতো ছিল অন্যায়কারী দল। দ্বিতীয় দল অন্যায়ে বাধা দানে সচেষ্ট ছিল। আর তৃতীয় দল অন্যায়কারী ছিল না বটে, কিন্তু অন্যায়ে বাধা দানে যারা সচেষ্ট ছিল তাদেরকে বলতো, ওদেরকে ওদের উপর ছেড়ে দাও। ওদের নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, ওদের বিষয় আল্লাহ দেখবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।
অতঃপর মহা-পরাক্রমশালী রব্বুল

“

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোতে কেন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকজন অন্যায় কাজে, যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বাধা দেয়নি? হ্যাঁ, তবে অল্প সংখ্যক ছিল যারা অন্যায়ে বাধা দিত। আমি তাদেরকেই আযাব থেকে রক্ষা করেছিলাম।

সূরা হুদ: ১১৬

”

আলামীন শুধুমাত্র অন্যায়ে বাধা দানকারী দলকে রক্ষা করলেন এবং বাকি দু'টি দলকে কঠিন শাস্তি দিলেন, তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করলেন। রব্বুল আলামীন কতই না স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন—

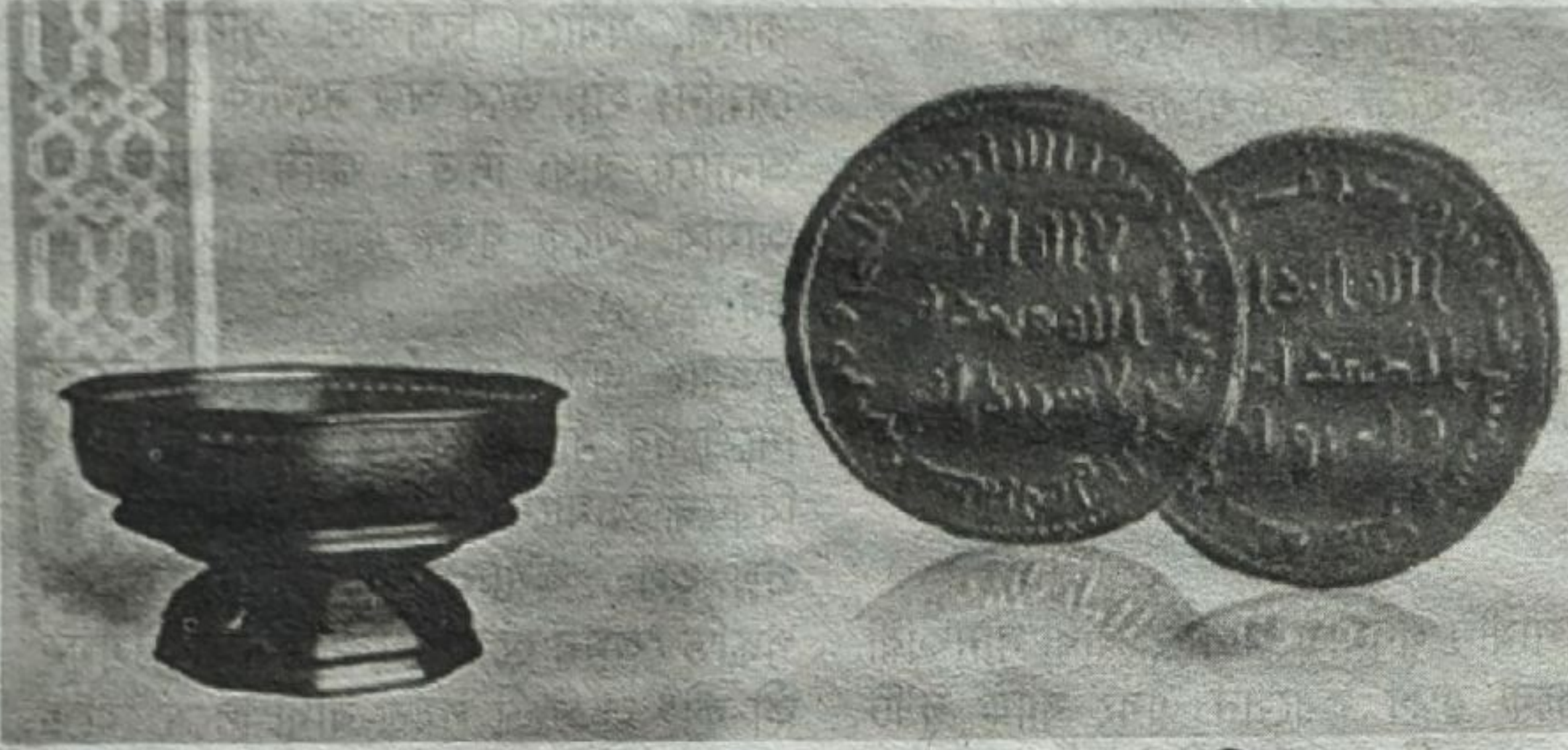
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোতে কেন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকজন অন্যায় কাজে, যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বাধা দেয়নি? হ্যাঁ, তবে অল্প সংখ্যক ছিল যারা অন্যায়ে বাধা দিত। আমি তাদেরকেই আযাব থেকে রক্ষা করেছিলাম। (সূরা হুদ: ১১৬)

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, আমাদের নিজেদের বাঁচার জন্যই অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রশ্ন হল— অন্যায় কাজে বাধা দানের পদ্ধতি কেমন হবে? এক্ষেত্রে বিভ্রান্তিসমূহ কী কী? কতক্ষণ পর্যন্ত বাধা দিয়ে যেতে হবে এবং এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কিনা? ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংখ্যায় বিষয়গুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রেখে আজ এখাই সমাপ্তি টানছি। আলাহুমা আমীন।



অর্থনীতিতে আল-কুরআনের তত্ত্ব মেনে নেয়াটাই ইমান যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার দাবি



শাইখ শূয়াইব মাহমুদ আত-তাইমী

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ তোমরা সেই সম্পদ হতে দান
করো, যে সম্পদে আল্লাহ তোমাদেরকে
প্রতিনিধিত্বরূপ মালিকানা দিয়েছেন।
(৫৭ নং সূরা আল-হাদীদ: ৭)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ
দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস
অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়াতে তোমার
বৈধ জীবনোপভোগ করতে ভুলে যেয়ো
না এবং ইহসান কর (অন্যদের প্রতি)
যেমনভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান
করেছেন। যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না
(সম্পদের অপব্যয়ের মাধ্যমে)। নিশ্চয়
আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন
না। (২৮ নং সূরা আল-কাসাস: ৭৭)

জড়বাদী (Materialistic) রা এবং
তাদের অনুসারী পুঁজিপতিরা সম্পদের

১৬ | আল যুয়ফান | জুন'১৫

একচ্ছত্র ও শর্তহীন মালিকানা
নিজেদেরই মনে করে। ফলে সম্পদের
উপার্জন ও বন্টনে নিজেদের স্বার্থ ধরে
রাখতে শোষণ, যুলুম, বঞ্চনা এসবের
কোনটিতেই তারা কার্পণ্য করে না। আর
এসবের বৈধতা পেতে এবং সম্পদের
উপর নিজেদের মালিকানা ও প্রাধান্য ধরে
রাখতে বিভিন্ন দেশের এই ধনিক শ্রেণি
ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনীতি সংক্রান্ত
আইন প্রণয়নে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।
এককথায় নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আইন
প্রণয়ন করে থাকে- এটাই হচ্ছে
অঘোষিত পুঁজিবাদ; যার ফল হলো
ধনী-দরিদ্রের অব্যাহত বেড়ে চলা
বৈষম্য। অর্থাৎ ধনী আরও সম্পদের
পাহাড় গড়ে তুলবে, বিপরীতে দরিদ্র
শ্রেণি আরো নিষ্পেষিত হবে। চলমান
বর্ষের জানুয়ারিতে করা এক জরিপে দেখা
যায়, বৈশ্বিক মোট সম্পদের প্রায়
অর্ধেকের মালিক হতে যাচ্ছে, মাত্র ১
(এক) শতাংশ ঐ ধনী ব্যক্তিবর্গ। আর
বাকি- অর্ধেকের মালিক হচ্ছে ৯৯
(নিরানব্বই) শতাংশ মানুষ। জরিপটি
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সমূহে গুরুত্বের
সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। মোট কথা,
জড়বাদীদের অর্থ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা
হল, 'যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন-দখল করব,

যেভাবে ইচ্ছা ভোগ বন্টন করব।' তাদের
এই ধ্যান-ধারণা নতুন নয়। তাই আমরা
পবিত্র কুরআনের আলোচনায় দেখি,
আল্লাহর নবী শূয়াইব (আ.) যখন তাঁর
জাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান
করছিলেন তখন তাদের একটি উত্তর ছিল
এই যে-

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ
تُتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
الرَّشِيدُ

হে শূয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে
এই নির্দেশ দেয় যে, আমরা আমাদের
বাপ-দাদারা যার ইবাদাত করেছে,
আমরা সেগুলোর ইবাদাত করতে পারবো
না? এমনকি আমরা আমাদের মালের
ব্যাপারেও যা ইচ্ছা তাই করতে পারব
না? তুমিতো দেখছি অত্যন্ত বুয়ুগ! (১১
নং সূরা হুদ: ৮৭)

একইভাবে শূয়াইব (আ.) পরবর্তী মুসা
(আ.)-এর জাতির অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি
কারুনকে যখন তার সম্পদের ব্যাপারে
আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বলা হল,
তখন সে উত্তর দিলো,

إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ
هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا

এই সম্পদ তো আমি আমার জ্ঞানবলে
প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না, তার পূর্বে
নিশ্চয় আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কত
সম্প্রদায়কে; যারা ছিল শক্তিতে-সম্পদে
তার চেয়ে অনেক উর্ধ্ব। (২৮ নং সূরা
আল-কাসাস: ৭৮)

জড়বাদী অসভ্যতার অর্থনৈতিক পরিসরে
একটি হল ঐ পুঁজিবাদ, যা
অর্থনৈতিকভাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; আর
একটি হল ঠিক ঐ পুঁজিবাদের বিপরীত,
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা তথা সাম্যবাদ
(Socialist economy
communism)

যা পুঁজিবাদের বিপরীতে শুনতে ভাল লাগে এমন কিছু শ্লোগান দিয়ে রাতারাতি জনসমর্থন আদায় করে ব্যাপক প্রাণহানির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে বর্তমান গণচীনে। এর ধারকদের অন্যতম শ্লোগান ছিল,

কেউ খাবে তো কেউ খাবে না,
তা হবে না তা হবে না।

এটা ছিল একটা প্রতারণামূলক শ্লোগান। যার নিচে অতি সহজেই দরিদ্র-নিষ্পেষিত শ্রেণিকে তৎকালীন সময়ের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অবস্থান করাতে তারা সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পরিসরে অর্থব্যবস্থাপনার নীতি ছিল, সম্পদের উপর কারও কোন ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না, বরং রাষ্ট্র হবে সকল সম্পদের মালিক। সাধারণ নাগরিকরা শুধু শ্রম বিনিয়োগ করে তার পরিবর্তে অর্থ পাবে। এতে নাগরিকরা হয়ে গেল কেবল রাষ্ট্র নামক মেশিনের কলকজার ন্যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, বঞ্চিতদের অধিকার বলতে কিছুই রইলো না। এমনকি কমিউনিজমের মূল তত্ত্বের উপরও তারা স্থির থাকতে পারল না। ফলে স্বল্প সময় যেতে না যেতেই নতুন নতুন সংযোজন-বিরোধে তারা বাধ্য হল। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কমিউনিজমের মূল তত্ত্বের উপর বর্তমানে কোন রাষ্ট্র নেই। আমরা এই তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমরা ছিলাম সম্পদের মালিকানা প্রশ্নের আলোচনায়। আমরা দেখতে পেলাম, জড়বাদীরাই পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে। অর্থাৎ পুঁজিবাদীরা সম্পদের উপর শর্তহীন মালিকানা দাবি করে বসে আছে। অন্যদিকে সমাজবাদী, সাম্যবাদীরা জনগণের কোন মালিকানাই স্বীকার করেনি। যার মধ্যে একটি হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক শোষণ আর অপরটি হল নির্বুদ্ধিতামূলক শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দু'টির মধ্যেই কুরআনুল হাকীমের সেই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি আসে যে, “যালিমরা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে, যাতে তারা নগদ সুখ-স্বচ্ছন্দ্য পায় তারই অনুসরণ করে। আর তার চেয়ে অধিক পথহারা কে হতে পারে, যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?” (আল-কুরআন- ৩০:২৯, ২৮:৫০; ১১:১১৬)

ইসলাম হল বিশ্বসৃষ্টার দেয়া
জীবনবিধান, ইসলাম হল
মানবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল
একটি বিধান, ইসলাম হল মানবতার
ধর্ম। অর্থনৈতিক প্রশ্নের ভারসাম্যপূর্ণ,
ইনসাফপূর্ণ সমাধান একমাত্র বিশ্বসৃষ্টা
আল্লাহর পক্ষেই দেয়া সম্ভব, যা
ইসলাম নামক দীন তথা
জীবনবিধানের মাধ্যমে মানুষ
পেয়েছে। এই ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত
স্থায়ী ব্যবস্থা।

ইসলাম হল বিশ্বসৃষ্টার দেয়া জীবনবিধান, ইসলাম হল মানবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি বিধান, ইসলাম হল মানবতার ধর্ম। অর্থনৈতিক প্রশ্নের ভারসাম্যপূর্ণ, ইনসাফপূর্ণ সমাধান একমাত্র বিশ্বসৃষ্টা আল্লাহর পক্ষেই দেয়া সম্ভব, যা ইসলাম নামক দীন তথা জীবনবিধানের মাধ্যমে মানুষ পেয়েছে। এই ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ব্যবস্থা। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই। রব্বুল আলামীন বিভিন্ন দৃষ্টান্ত, প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ ও তথ্যবহুল বর্ণনার দ্বারা জগৎবাসীর নিকট এটা প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অস্তিত্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই এর একচ্ছত্র মালিক এবং মানুষের মৃত্যুর পর বা সবকিছু ধ্বংস হবার পরও তিনিই আসমান-যমীনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আর অর্থ-সম্পদের বেলায় মানুষকে দেয়া হয়েছে প্রতিনিধিত্বস্বরূপ সাময়িক মালিকানা। মানুষ উক্ত মালিকানার দখল রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্টনে আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। এই তত্ত্ব মেনে নিলেই শোষণ, সামাজিক ভারসাম্যহীনতা, বিশৃঙ্খলা, দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা দূরীকরণ অত্যন্ত সহজ হবে। আর এই তত্ত্ব মেনে নেয়াটা প্রথমত ঈমানের দাবি। এরপর যে কেউই যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার দর্পণে মিলিয়ে নিতে পারেন, কোন আপত্তি নেই।

জীবনোপকরণের বেলায় ধনী-গরীবের ব্যবধান কেন?

মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি যেমন, রোদ-বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদিতে রব্বুল আলামীন মানুষের জন্য সমান সমান সুযোগ রেখেছেন। এগুলো রব্বুল আলামীনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত হয়ে মানুষকে বা সকল প্রকার সৃষ্টিকে সেবা দিয়ে থাকে। এসবের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ চলে না। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির স্বাভাবিক পরিমন্ডলে মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। মানুষকে দেয়া আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি, মেধা, কারিগরি উদ্ভাবনী ক্ষমতা, হাত, পা ইত্যাদির প্রয়োগে এসব অর্জন-উপার্জন করে নিতে হয়; এভাবেই রব্বুল আলামীন মানব জীবনকে সুবিন্যস্ত করেছেন, যেন তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায়।

জীবনোপকরণ উপার্জনের এই প্রচেষ্টায় যমীনের তথা পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতেই জীবনোপকরণে কাউকে বেশি দিয়েছেন, আবার কাউকে কম। এভাবেই ধনী-গরীবের একটা ব্যবধান করেছেন যেন, (১) রব্বুল আলামীন উভয় শ্রেণিকে পরীক্ষা করতে পারেন, কে তাঁর আনুগত্যে অগ্রগামী। (২) মানুষ যেন একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হয় এবং এভাবে মানব পরিমন্ডলে যথাযথ ভারসাম্য বজায় থাকে। রব্বুল আলামীনের ঘোষণায় এসেছে-

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

আর যদি দুনিয়াতে সকলকে জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দেয়া হত তবে যমীনে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, তাই আল্লাহ সজ্ঞানেই পরিমাণমত নাযিল করেন। (৪২ নং সূরা আশ-শূরা: ২৭) আমিই মানুষের মাঝে দুনিয়ার জীবনে জীবনোপকরণের বন্টন করি। তাদের কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছি, যেন একদল অন্যদলের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। (সূরা যুখরুফ: ৩২)

তবে ধনী-গরীবের এই ব্যবধান নিজ নিজ শ্রেণির মধ্যে স্থায়ী বা সীমাবদ্ধ নয়; বরং আজ যে ধনী আগামীকাল সে এ পর্যায়ে নাও থাকতে পারে। আর আজ যে গরীব আগামীকাল তার মধ্যে ধনাঢ্যতা আসতে পারে, এমন ব্যবস্থাও রব্বুল আলামীন রেখেছেন এবং উপায় সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন।

(ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংখ্যায়)



জামাআত ও ইতাআত একটি আরেকটির সাথে
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির
বিষয়ে চিন্তাই করা যায় না। মুসলিম জাহানের অন্যতম
খলিফা বিশিষ্ট সাহাবী উমর (রা.) এ সম্পর্কে কতই না
সুন্দর উক্তি করেছেন- “ইসলাম নেই জামাআত ছাড়া,
জামাআত নেই নেতৃত্ব ছাড়া, নেতৃত্ব নেই
আনুগত্য ছাড়া।”

জামাআত ও ইতাআত

ড. নাসরুল্লাহ মানসুর

জামাআত আরবি শব্দ, যার
আভিধানিক অর্থ- ঐক্যবদ্ধ
দল; যা বিচ্ছিন্নতার ঠিক
বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে-
কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ
জনসমষ্টিকে জামাআত বলা
হয়। মূলত জামাআতের
কর্মীবাহিনী একটি মজবুত
দেয়াল সদৃশ। যার একটি ইট
অপরটির সাথে সুশৃঙ্খল ভাবে
গ্রথিত। কোন একটি ইট কেউ
সরিয়ে নিতে চাইলেও তার
পক্ষে একাজ সহজ নয়। এ
দেয়াল দুর্বল নয় যে, সামান্য
আঘাতেই দুমড়ে-মুচড়ে যাবে।
বরং ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য
করেও তা পূর্বের মতোই টিকে
থাকে।

রব্বুল আলামীন মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব
হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।
আর তাঁর এ শ্রেষ্ঠ বান্দাদেরকে তিনি
দান করেছেন ভাল-মন্দ বুঝার মতো
স্পষ্ট জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা করার অবাধ
সুযোগ ও সত্য-মিথ্যাকে গ্রহণ করার
স্বাধীনতা। সাথে সাথে তিনি অসংখ্য
নবী-রাসূলদের প্রেরণ করে এ কথাও
জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা সত্য তথা
আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ
করবে তাদের পুরস্কার ও যারা তা
প্রত্যাখ্যান করবে তাদের ভয়াবহ
পরিণতির কথা। তাই প্রত্যেক
নারী-পুরুষের কতব্য হচ্ছে রব্বুল
আলামীনের প্রতিটি বিধানকে যথাযথ
ভাবে অনুসরণ করা। এ বিধানকে
প্রত্যাখ্যান করা বা অনুসরণের ক্ষেত্রে
শৈথিল্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের
কাজ নয়। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা
জানার পরও কোন সুস্থ বিবেকবান
মানুষ সেদিকে পা বাড়াতে পারে না।
কোন জ্ঞানবান মানুষ কখনো লাভ
ছেড়ে ক্ষতির দিকে ধাবিত হয় না।
এরপরও যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের
দিকে ঠেলে দেয় তারা আল্লাহর দেওয়া
বিধি-বিধান সম্পর্কে অসচেতন অথবা
তারা এ সমাজের সবচেয়ে বোকাদের
দলভুক্ত। সমাজের প্রত্যেক মানুষের
উচিত মহান স্রষ্টার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান
অর্জন করে সত্যকে গ্রহণ করা। আজ

আমরা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ
একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব
(ইনশাআল্লাহ) যা মুসলিম উম্মাহর
পক্ষে এড়িয়ে চলা আদৌ উচিত নয়।
আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-
জামাআত ও ইতাআত।

জামাআত ও ইতাআত একটি
আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে
জড়িত। এর একটিকে বাদ দিয়ে
অপরটির বিষয়ে চিন্তাই করা যায় না।
মুসলিম জাহানের অন্যতম খলিফা
বিশিষ্ট সাহাবী উমর (রা.) এ সম্পর্কে
কতই না সুন্দর উক্তি করেছেন-
“ইসলাম নেই জামাআত ছাড়া,
জামাআত নেই নেতৃত্ব ছাড়া, নেতৃত্ব
নেই আনুগত্য ছাড়া।” জামাআত ও
ইতাআত মুমিন জীবনের অপরিহার্য
একটি অংশ। ইসলামী শরীয়তেও এর
গুরুত্ব অপরিমিত। তাই আসুন
পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো আলোচনা করে
জেনে নেই। প্রথমে জেনে নেওয়া
যাক-

জামাআত কী?

জামাআত আরবি শব্দ, যার
আভিধানিক অর্থ- ঐক্যবদ্ধ দল; যা
বিচ্ছিন্নতার ঠিক বিপরীত। পারিভাষিক
অর্থে- কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে
বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ
জনসমষ্টিকে জামাআত বলা হয়। মূলত

জামাআতের কর্মীবাহিনী একটি মজবুত দেয়াল সদৃশ। যার একটি ইট অপরটির সাথে সুশৃঙ্খল ভাবে গ্রথিত। কোন একটি ইট কেউ সরিয়ে নিতে চাইলেও তার পক্ষে একাজ সহজ নয়। এ দেয়াল দুর্বল নয় যে, সামান্য আঘাতেই দুমড়ে-মুচড়ে যাবে। বরং ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও তা পূর্বের মতোই টিকে থাকে। কিন্তু এই ইটগুলোকে যদি মজবুত গাঁথুনি দিয়ে না রেখে একের পর এক সাজিয়ে রাখা হয় তখন তাকে ভুলক্রমেও কেউ দেয়াল হিসেবে আখ্যায়িত করবে না। বললে বড় জোর ইটের স্তূপ বলতে পারে। যে কেউ এখান থেকে ইচ্ছামত ইট সরিয়ে নিতে পারবে; এতে তার কোন বেগ পেতে হবে না। সামান্য ধাক্কা বা আঘাতেই তা যমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং একই উদ্দেশ্যে যখন কোন কর্মীবাহিনী একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় কেবল তখনই তাকে জামাআত বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে একই উদ্দেশ্যে পথ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জামাআত বলে গণ্য হবে না; বরং তারা বিচ্ছিন্ন কোন জনসমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে। এরা মূলত স্তূপকৃত ইটের মত যা কোন বন্ধনে আবদ্ধ নয়। জামাআতের অন্তর্ভুক্ত সাথীদের বন্ধন এতটাই অটুট যে, শয়তান কাউকে ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে চাইলেও সহজে সফল হতে পারে না। শত্রুর সামান্য আঘাতেই তারা বিচলিত হয়ে পড়ে না; বরং সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মুকাবেলা করে তাদের কাফেলাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

অপরদিকে একই উদ্দেশ্যে ধাবিত জনসমষ্টি স্তূপকৃত ইটের মত সেখানে কে এলো আর কে গেলো কেউ কারো খোঁজ রাখে না। শত্রুর বাধার সম্মুখীন হলে নিজ উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে তারা জান বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং একই লক্ষ্যে চললেই তারা জামাআত নয়; বরং একই সূত্রে গাঁথা একটি সুশৃঙ্খল জনসমষ্টির সমন্বয়ই হচ্ছে জামাআত। এ জামাআত ইসলামী ও অনৈসলামী উভয়ই হতে

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে একই উদ্দেশ্যে পথ চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জামাআত বলে গণ্য হবে না; বরং তারা বিচ্ছিন্ন কোন জনসমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে। এরা মূলত স্তূপকৃত ইটের মত যা কোন বন্ধনে আবদ্ধ নয়। জামাআতের অন্তর্ভুক্ত সাথীদের বন্ধন এতটাই অটুট যে, শয়তান কাউকে ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে চাইলেও সহজে সফল হতে পারে না। শত্রুর সামান্য আঘাতেই তারা বিচলিত হয়ে পড়ে না; বরং সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মুকাবেলা করে তারা তাদের কাফেলাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

পারে। আমরা এখানে অনৈসলামী জামাআত নিয়ে আলোচনা করব না। আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলামী জামাআত। তাহলে জেনে নেওয়া যাক—

ইসলামী জামাআত কী?

“আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে ইসলামী জামাআত বলে।” আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গঠিত জামাআতকে ইসলামী জামাআত বলে বিবেচনা করা উচিত হবে না। কোন সংগঠনের কিছু কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করলেও যদি তারা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্যকোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পথ চলে তাহলে তারা যে নীতিমালা অনুসরণ করে পথ চলবে সেই জাতীয় সংগঠন বলে বিবেচিত হবে। যদি কেউ সমাজতন্ত্রের নীতিমালা মেনে চলে তবে তা সমাজতান্ত্রিক সংগঠন। কেউ গণতন্ত্রকে অনুসরণ করলে তা গণতান্ত্রিক সংগঠন। এমনিভাবে যারা যে নীতিমালা মেনে চলবে তাদের সে সংগঠনও হবে অনুরূপ। আর যারা ইসলামকে মেনে চলবে তাই হবে ইসলামী জামাআত।

ইসলামী জামাআত সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ধারণা পেলাম। এবার আসা যাক জামাআতবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন মতবাদ বা আদর্শ নিজেদের মনের ভেতর লালন-পালন করে চলেছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে জামাআতবদ্ধ থাকলেও অধিকাংশ লোকের মনোভাব প্রকাশিত নয়। বিভিন্ন ঘটনা বা আলোচনার

প্রেক্ষিতে জানা যায় তারা কোন না কোন একটি আদর্শ বা মতবাদকে সমর্থন করে। যদি কেউ তাদের মতাদর্শের পক্ষাবলম্বন করে কথা বলে তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কথাতে সমর্থন করে। আবার কেউ বিপরীতধর্মী কোন বক্তব্য পেশ করলে তারা বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে তার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এরকম সমর্থন বা টিলেমি স্বভাব দুনিয়াবী জীবনে সমস্যা না হলেও ইসলামের অনুসারীদের জন্য এটা আদৌ উচিত নয়। তাদের জামাআতবদ্ধ হয়েই জীবন-যাপন করা উচিত। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—

জামাআতবদ্ধ হব কী কারণে?

আসলে জামাআতী জীবন যাপনের জন্য ইসলাম সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, “ইসলামের যাবতীয় বিধানসমূহ এককভাবে মেনে চলা সম্ভব নয় বিধায় রব্বুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশেই জামাআতবদ্ধ হতে হবে।” রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দীনকে) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৩ নং সূরা আল-ইমরান: ১০৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

হুয়াইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা নবী (সঃ) এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে

প্রশ্ন করতো। কিন্তু আমি তাঁর কাছে বরাবরই অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম এই আশংকায় যে, না জানি সে অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করে ফেলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমরা মূর্খতা, অন্ধকার ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম, অতঃপর রব্বুল আলামীন আমাদেরকে এই কল্যাণের (ঈমানের) মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এই কল্যাণের পর কি আবার কোন অকল্যাণ আসতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম- সেই অকল্যাণের পর কি পুনরায় কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তবে তার মধ্যে সুপ্ত অকল্যাণ নিহিত থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই সুপ্ত অকল্যাণ কি? তিনি বললেন, সেই সময় এমন লোকের আবির্ভাব হবে যারা আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে অন্যপথ অবলম্বন করবে এবং আমার হিদায়াত পরিত্যাগ করে অন্যত্র পথনির্দেশ খোঁজ করবে। এদেরকে তুমি নেক কাজও করতে দেখবে এবং মন্দ কাজও করতে দেখবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম এই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে, যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এদের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের গোত্রীয় লোক (মুসলিম) এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে তাহলে এ সম্পর্কে আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তুমি অবশ্যই মুসলমানদের জামাআত এবং তাঁদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআত এবং মুসলিম ইমাম না থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তখন তুমি সমস্ত দলাদলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ; যদিও তোমাকে (জঙ্গলে) গাছের শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয় এবং এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়। (সহীহ বুখারী, ই. ফা.



আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিনজন লোক একত্রিত হলে তাদের একজন তাদের ইমাম বা নেতা হবে। আর ইমামত বা নেতৃত্বের সবচাইতে বেশি হকদার সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। (সহীহ মুসলিম, ই. সে. হাদীস নং ১৪১৩) তিনজন মুসলিম একত্রিত হলেই দীনি ও দুনিয়াবী কাজ আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যেই একজন ইমাম বা নেতার অধীনে জামাআতবদ্ধ হতে হবে। একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী দ্বারা যতটুকু কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব বিচ্ছিন্ন কোন জনসমষ্টি দ্বারাও তা সম্ভব নয়; যদিও তারা সংখ্যায় অধিক।

বা. হাদীস নং ৬৬০৫; সহীহ মুসলিম, ই. সে. হাদীস নং ৪৬৩৩)

আলোচ্য আয়াত ও হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো নয় বরং আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করবে। এতে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মতবাদ চালু করা হারাম ও শয়তানের কাজ। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর বিধানকে আঁকড়ে ধরে তারা এক জাতি, আর যারা কাফের ও তাঁর বিধানের সাথে জড়িত নয় তারা আরেক জাতি। রব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত জীবনব্যবস্থা কাজে কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। প্রত্যেক

মুসলিম সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। কেউ বিচ্ছিন্ন হবে না। কোন বুদ্ধিমান মানুষ কখনো আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে না। নির্বোধ ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর অবাধ্য হয় না। সুতরাং আমাদেরও জামাআতবদ্ধ না হয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা উচিত হবে না।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিনজন লোক একত্রিত হলে তাদের একজন তাদের ইমাম বা নেতা হবে। আর ইমামত বা নেতৃত্বের সবচাইতে বেশি হকদার সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। (সহীহ মুসলিম, ই. সে. হাদীস নং ১৪১৩) তিনজন মুসলিম একত্রিত হলেই দীনি ও দুনিয়াবী কাজ আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যেই একজন ইমাম বা নেতার অধীনে জামাআতবদ্ধ হতে হবে। একটি ক্ষুদ্র জামাআতের সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী দ্বারা যতটুকু কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব বিচ্ছিন্ন কোন জনসমষ্টি দ্বারাও তা সম্ভব নয়; যদিও তারা সংখ্যায় অধিক।

অনেকেই হুযাইফা ইবনে ইয়ামানর হাদীসের শেষের অংশ উল্লেখ করে বলে থাকেন, এখন সমস্ত দল-মত বর্জন করে চলতে হবে, বেড়া-বকরি নিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে হিজরত করতে হবে ইত্যাদি। সত্যিই করুণার উদ্বেক হয় তাদের জ্ঞানের প্রতি। আল্লাহ্ আকবার! এ অবস্থা তো ঐ সময়ের জন্য, যখন মুসলিমদের কোন জামাআত না থাকবে। অথচ বর্তমানে মুসলিমদের সেই মুহাজিরীন-মুকাতিলীন জামাআত রয়েছে, ইমাম ও ইমারত রয়েছে, ফালিহ্লাহিল হামদ! যারা উপরোক্ত পরাজিত মনোভাবের প্রচার-প্রসার করছেন, তারা কিন্তু নিজেরা হিজরতও করছেন না, আবার গুরাবা-মুকাতিলদের সেই সুসংবাদপ্রাপ্ত জামাআতেও যোগ দিচ্ছেন না। তাহলে তারা আছেন কোন্ দলে?

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)



ইহুদি সম্প্রদায় অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী (১ম পর্ব)

ইবনু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল

ইহুদি সম্প্রদায় বা জুইশ কমিউনিটির ইতিহাস প্রায় ৩০০০ হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর ইতিহাস টেনে আনলে দেখা যায়, ইহুদিরা হলো সবচেয়ে অত্যাচারিত সম্প্রদায়, যাদের উপর শুধু বছরের পর বছর অত্যাচার করা হয়েছে। অথচ বর্তমানে বিশ্বমানচিত্রে তারা একটি অত্যাচারী জাতি হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। একটি নির্ধারিত ও অত্যাচারিত সম্প্রদায় কীভাবে নিজেরাই অত্যাচারী হয়ে উঠল সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইনশাআল্লাহ আমরা এ ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সেটাই তোলে ধরার প্রচেষ্টা চালাবো।

তিন হাজার বছর আগে ইহুদি সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু হয়। ইহুদিধর্ম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম ধর্ম যা এখনো অনেক মানুষ পালন করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলিদের আদি নিবাস ছিল। তবে তারা এখন যে জায়গা চিহ্নিত করেছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। আব্রাহাম নবী মুসা (আ.) বা মোজেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সুন্দর সময় পার হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে সম্রাট ডেভিড বা দাউদ (আ.)-এর সময়ে। দাবি করা হয়- বর্তমান সময়ের লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও মিশরের বড় অংশই ছিল তখনকার কিংডম অব ইসরায়েলের অংশ। ডেভিডের ছেলে সলোমন বা সুলাইমান (আ.)-এর সময়ও তাদের অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এ জাতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ সময় আসিরিয়ানরা ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে ও দখল করে নেয়। এরপর বিভিন্ন সময় ব্যাবিলনিয়ান, পার্সিয়ান,

হেলেনেস্টিক, রোমান, বাইজেন্টাইন, অটোমান, ব্রিটিশ শাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে পাড়ি দেয় এই অঞ্চল। আর এ সময় ক্ষণে ক্ষণেই ইহুদিদেরকে তাড়া খেতে হয়।

ঈজিপশিয়ান ফারাও (কুরআনে বর্ণিত ফেরাউন)-এর সময় থেকে শুরু করে জার্মানির হিটলারের সময় পর্যন্ত তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। তবে এখন যেমন ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সংঘাত চলছে এক সময় তা ছিল কৃষ্টিয়ান ও ইহুদি সংঘাত। স্পেনে মুসলিমদের রাজত্বে ইহুদিরা খুবই সুখ-শান্তিতে ছিল। তারা এ সময় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করার ব্যাপক সুযোগ পায়। মুসলিমদের এই উদারতার কথা ফুটে উঠেছে ইহুদিদের লেখা ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায়।

শুরু থেকেই বিভিন্ন সমাজে ইহুদিদের ঘৃণিত, অবহেলিত ও খারাপভাবে দেখা হতো। প্রায় প্রতিটি জায়গায় তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকতো। উগ্র কৃষ্টিয়ানরা তাদের কখনই সহ্য করতে পারেনি। এদের অনেকেই যিশুর হত্যাকারী হিসেবে ইহুদিদের চিত্রিত করেছে। অনেকেই তাদের অভিশপ্ত জাতি মনে করে। ইহুদিরা যেহেতু তাড়া খেতো বেশি সেহেতু তারা তাদের যাযাবর জীবনে স্থায়ী কাজের চেয়ে বুদ্ধিনির্ভর ও কম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বেছে নেয়। এক্ষেত্রে ব্যবসার প্রতি কৃষ্টিয়ানদের অনিহা তাদের সামনে আরও বড় ধরনের সুযোগ এনে দেয়। তাদের বসবাসের পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। ভাল খাবার দাবারও ছিল না। ফলে তারা এমন কাজে আত্মনিয়োগ

ঈজিপশিয়ান ফারাও
(কুরআনে বর্ণিত

ফেরাউন)-এর সময় থেকে শুরু করে জার্মানির হিটলারের সময় পর্যন্ত তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। তবে এখন যেমন ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের সংঘাত চলছে এক সময় তা ছিল কৃষ্টিয়ান ও ইহুদি সংঘাত। স্পেনে মুসলিমদের রাজত্বে ইহুদিরা খুবই সুখ-শান্তিতে ছিল। তারা এ সময় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করার ব্যাপক সুযোগ পায়। মুসলিমদের এই উদারতার কথা ফুটে উঠেছে ইহুদিদের লেখা ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায়।

করে, যেখানে বুদ্ধির চর্চা বেশি। ব্যবসা, টাকা-পয়সা, লেনদেন, দালালি- এসব কাজে তারা এগিয়ে যায় বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য।

ইহুদি সম্প্রদায়কে ইউরোপে কিভাবে দেখা হতো তার বড় উদাহরণ হতে পারে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকের শাইলক চরিত্রটি। যে শরীরের মাংশ কেটে তার পাওনা আদায়ের দাবি জানায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা রাশিয়ান লেখক নিকোলাই গোগল তার তারাস বুলবা উপন্যাসে আরেক ইহুদি সুযোগ সন্ধানী চরিত্র ইয়ানকেল-কে সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তখনকার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব।

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত তাড়া খেয়ে খেয়ে তারা মিডল ইস্টে ঢুকতে থাকে। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান একটি চালও ছিল। কৃষ্টিয়ানরা যেহেতু ইহুদিদের পছন্দ করতো না, তাই তারাও চাচ্ছিল মুসলিমদের এলাকায় তাদের ঢুকিয়ে দিতে। আর প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চলমান যাযাবর জীবনের অবসানও চাচ্ছিল ইহুদিরা।

এতোগুলো বছর তাদের ঐক্য ধরে রাখার বড় শক্তি ছিল ধর্ম। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদি সম্প্রদায়ের সব সময় স্বপ্ন ছিল তারা তাদের নিজ দেশ ইসরায়েলে ফিরে যাবে, যদিও তখনো এর কোনো ভৌগলিক অস্তিত্বই ছিল না! ইসরায়েল তাদের মাতৃভূমি ও ধর্মভূমিই শুধু নয়, তাদের স্বপ্নভূমিও বটে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বপ্ন দেখেছে ইসরায়েল নামেক দেশের। নেবুট ইয়ার ইন জেরুজালেম- এই মন্ত্র জপতে জপতে বহু ইহুদি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। ইসরায়েলের জন্য তারা সাধ্যমতো দান করেছে। ধর্ম ও বিশ্বাস দিয়ে নিজেদের এক করে রেখেছে। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়ার পরও ক্ষুরধার বুদ্ধি, কৌশল ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নিজেদের বসিয়েছে। কোনো মেধাবী ইহুদি ছাত্র বা ছাত্রীর পড়াশোনার জন্য চিন্তা করতে হয় না। এখনো বহু ওয়েব সাইটে এদের জন্য

শুধু আবেগ বা অভিশাপ দিয়ে ইসরায়েলকে দমন করা সম্ভব নয়। কেননা তাদের ভূমিটুকু আছে মিডল ইস্টে; কিন্তু এর নিয়ন্ত্রকরা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।



দান গ্রহণ করা হয়। তারা প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখে। কমিউনিটির কেউ বিপদে পড়লে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন অনেক ওয়েব সাইট আছে যেখানে ইহুদি পরিবারগুলোর বংশলতিকা বা ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করতে সাহায্য করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধাওয়া খেয়ে ইহুদিরা বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের স্বপ্নভূমির কথা কখনো ভুলেনি। এক্ষেত্রে তাদেরকে খুবই কটর ও চরমপন্থী বলা যেতে পারে। কারণ মিডল ইস্টের কোনো এক জায়গায় তাদের জন্মভূমি ছিল তিন হাজার বছর আগে সেই যুক্তিতে একটি জায়গার দখল নেয়া একটি অবাস্তব বিষয়। কেননা এর কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু ইহুদিরা তা তৈরি করে নিয়েছে। তারা বিশ্বশক্তিকে তাদের পক্ষে কাজে লাগিয়েছে।

ইরাক যখন কুয়েত দখল করে নেয় তখন সাদাম হোসেন বলেছিলেন, কুয়েত ঐতিহাসিকভাবে ইরাকের অংশ। কিন্তু সে যুক্তি বাতিল হলেও ইহুদিদের যুক্তি বাতিল হয়নি। এ কারণে ইসরায়েল রাষ্ট্রটির জন্ম হলো ১৯৪৮ সালে তখন একসঙ্গে আরব দেশগুলো আক্রমণ চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

বর্তমান বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা মাত্র দেড় কোটি। তা-ও তারা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশে। যেমন আমেরিকায় আছে প্রায় ৬০ লাখ,

ইসরায়েলে আছে প্রায় ৫০ লাখ, কানাডায় আছে প্রায় ৪ লাখ, ব্রুটনে প্রায় ৩ লাখসহ ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ইউক্রেন, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে তাগুতী মতবাদটি সবচেয়ে প্রভাব ফেলেছে সেই কমিউনিজমের স্বপ্নদ্রষ্টা কার্ল মার্কস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে এসেছে। বিশ্বের মানুষকে মুক্ত করে রাখা যাদুশিল্পী হুডি নি ও বর্তমানে ডেভিড কপারফিল্ড এসেছে একই কমিউনিটি থেকে। আর আছে, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড। লেখকদের মধ্যে আর্থার মিলার, ফ্রানজ কাফকা, সাইন্স ফিকশান জগতের সবচেয়ে আলোচিত লেখক আইজাক আসিমভ। মিউজিকে ইহুদি মেনুহিনের অসাধারণ ভায়োলিনের পাশাপাশি রিঙ্গো স্টার, মার্ক নাফলারের মতো বাদক যেমন এসেছে তেমনি বব ডিলান, বব মার্লির মতো গায়কও এসেছে। মাত্র কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো। এধরনের নাম অসংখ্য আছে।

ইহুদি কমিউনিটির সদস্যদের হাতে মেডিসিন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকোনোমিক্স, লিটারেচার ও পিচ বিভাগে এখন পর্যন্ত ১৭৫টিরও বেশি নোবেল পুরস্কার এসেছে। এ থেকে তাদের মেধার বিস্তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ইসরায়েলের প্রয়োজনে এসব বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, মিডিয়া মুঘল, রাজনীতিবিদ সবাই মিলিতভাবে তাদের স্বপ্নভূমিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। তারা যে যেই মতেরই হোক না কেন, এ-বিষয়ে তাদের কোন মতভেদ থাকে না। ফলে হাজার অপরাধ করার পরও ইসরায়েলকে স্পর্শ করা যায় না।

শুধু আবেগ বা অভিশাপ দিয়ে ইসরায়েলকে দমন করা সম্ভব নয়। কেননা তাদের ভূমিটুকু আছে মিডল ইস্টে; কিন্তু এর নিয়ন্ত্রকরা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

(ইনশাআল্লাহ, বিস্তারিত আগামি পর্বে)



শাবান মাসে যা করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ আবুল হাসনাত মুহাম্মাদ সালিহ

হালুয়া-রুটি সম্পর্কে এসব আলিমরা বলে থাকেন যে, ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দান্দান মুবারক উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হবে (?)।

আজব ব্যাপার! উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দুমাস পূর্বে শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে!

আরবি বর্ষের অষ্টম মাস শাবান। এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাত বলা হয়। শবে বরাত শব্দটি ফারসি। শব মানে রাত্রি, আর বরাত মানে ভাগ্য অর্থাৎ ভাগ্য-রজনী। দ্বিতীয় শব্দটি আরবি। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবে বরাত সৌভাগ্য-রজনী হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। চ্যানেলে চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যশ-খ্যাতির মোহে অন্ধ একদল আলিমদের সেখানে ডাকা হয় আলোচনার জন্য। তাদের আলোচনার সারাংশ হলো- এ রাতে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রুখি বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউত ও ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এই রাতে রুহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুলাকাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবা যারা তাদের স্বামীদের রুহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রুহের আগমনের আশায় বুক বেধে বসে থাকতে হবে। বাসগৃহ ধূপ-ধূনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করতে হবে। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করতে হবে। মৃতের আত্মীয়দের সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যেতে হবে। হালুয়া-রুটির হিড়িক ফেলে দিতে হবে। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত

কাটিয়ে দিতে হবে। যারা কখনো সালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে সালাতে আলফিয়াহ বা ১০০ রাকআত সালাত আদায়ে রত হতে হবে, সেখানে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়তে হবে। আর বাস্তবে এটাই হলো এদেশে শবে বরাতের নামে প্রচলিত ইসলামি পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি

মোটামুটি এই ভিত্তিহীন বিশ্বাসগুলোই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে-

এ রাতে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাকদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাখিল হয়েছিল। এ রাতে রুহগুলি ছাড়া পেয়ে দুনিয়ায় নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে এসব আলিমরা বলে থাকেন যে, ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দান্দান মুবারক উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হবে (?)।

আজব ব্যাপার! উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দুমাস পূর্বে শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব।

এর পক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীস বিকৃতভাবে পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ:

১. প্রথমত এই আয়াতটিই দুমড়েমুচড়ে পেশ করা হয় শবে বরাতের পক্ষে—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فَيُنْفِقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكْمًا

অর্থ: নিশ্চয় আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে; যে রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪৪ নং সূরা আদ-দুখান: ৩-৪)

হাফিয ইবনু কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এখানে বরকতময় রজনী অর্থ লাইলাতুল কদর। যেমন রব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাত্রিতে। (৯৭ নং সূরা আল-কাদর: ১)

আর কদরের রাত যে রমায়ান মাসে এটাতো সকলেরই জানা। রব্বুল আলামীন বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
এই সেই রমায়ান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (২ নং সূরা আল-বাকার: ১৮৫)

সুতরাং সূরা দুখানের উপরোক্ত আয়াতদ্বারা কোনভাবেই শবে বরাত প্রমাণিত হয়না। কারণ এখানে লাইলাতুল মুবারাকা বলতে রব্বুল আলামীন রমায়ান মাসের লাইলাতুল কাদরকেই বুঝিয়েছেন।

আর এই রাতে এক শাবান হতে আরেক শাবান পর্যন্ত বান্দার রুযি, বিয়ে-শাদি, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীস প্রচারিত আছে, তা মুরসাল ও যঈফ এবং কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। কেননা কদরের রজনীতেই লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হতে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলি তথা মৃত্যু, রিয়িক ও অন্যান্য

শবে বরাতের প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন সহীহ ভিত্তি নেই। বরং শবে বরাত বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামি শরীআতে এই নামের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাকি রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে সিয়াম পালন ও রাতে ইবাদাত করা হয়। অন্তত ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাস (কুল হুওল্লাহু আহাদ) পড়তে হয়। এই সালাতটি গোসল করে আদায় করলে নাকি গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাকআত নফল সালাতের সওয়াব পাওয়া যায় (?)। এটাকে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হয় যে, ছোটবেলায় মাদরাসায় পড়াকালীন ছয়ররা আমাদেরকে গোসল করতে বাধ্য করতেন!!!

ঘটনাবলি যা সংঘটিত হবে, সেগুলি ফিরিশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন উমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহহাক প্রমুখ সালাফে সালাহীনের নিকট হতে। অতঃপর তাকদীর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হলো—

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ - وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ

অর্থ: তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ আছে। (৫৪ নং সূরা আল-কামার: ৫২-৫৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
كُتِبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ মাখলুকাতের তাকদীর লিখে রেখেছেন (সহীহ মুসলিম: ৬৬৯০) আবু হুরাইরা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে (পুনরায় তাকদীর লিখিত হবে না)। (বুখারী: ৫০৭৫, তিরমিযী: ২৬৪২; নাসায়ী: ৩২১৫)

শবে বরাতের প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন সহীহ ভিত্তি নেই। বরং

শবে বরাত বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামি শরীআতে এই নামের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাকি রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে সিয়াম পালন ও রাতে ইবাদাত করা হয়। অন্তত ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাস (কুল হুওল্লাহু আহাদ) পড়তে হয়। এই সালাতটি গোসল করে আদায় করলে নাকি গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাকআত নফল সালাতের সওয়াব পাওয়া যায় (?)। এটাকে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হয় যে, ছোটবেলায় মাদরাসায় পড়াকালীন ছয়ররা আমাদেরকে গোসল করতে বাধ্য করতেন!!!

এ সম্পর্কে প্রধানত যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা হলো—

১. আলী (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

মধ্য শাবান এলে তোমরা রাত্রিতে কিয়াম করো ও দিনে সিয়াম পালন করো। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, আচ্ছো কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে

ক্ষমা করে দেবো; আছো কি কেউ রুযি প্রার্থী আমি তাকে রুযি দেবো। আছো কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করবো।

জবাব: হাদীসটি ইবনে মাজাহ তার সুনানে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে (বর্ণনা পরস্পরায়) আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আবু সুবরাহ নামে একজন রাবী আছে, ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইবনে মুঈন বলেন, এ লোক মিথ্যা হাদীস রটাতো। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এ লোকটি প্রত্যাখ্যান যোগ্য। (মিযানুল ইতিদাল ৪র্থ খন্ড, ৫০৩-৫০৪ পৃ.)

দ্বিতীয়ত: হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে ইবনু মাজাহর ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়িশা (রা.) হতে (হা. ন. ১৩৬৬) এবং সহীহুল বুখারীর (মীরাঠী ছাপা ১৩২৮ হি.) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় ও কুতুবে সিভাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মধ্য শাবান না বলে প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। অতএব সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনানুযায়ী রব্বুল আলামীন প্রতি রাত্রের তৃতীয় প্রহরে নিচের আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শাবানের রাত্রিতে নয়। সুতরাং ৩০ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে একটা যঈফ হাদীস কী করে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

২. মা আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এক রাত্রিতে একাকি মদীনার বাকী গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়িশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শাবানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের ছাগলসমূহের লোম সংখ্যার চাইতেও অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন।

মোল্লা আলী কারী হানাফি (মৃত. ১০১৪ হি.) বলেন, “জুমআ ও ঈদায়নের সালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সালাতে আলফিয়াহ নামে শবে বরাতে যে সালাত আদায় করা হয় এবং এর পক্ষে যেসব হাদীস ও আসার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট, মাউযু অথবা যঈফ। এই বিদআত ৪৪৮ হিজরিতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের জাহিল ইমামরা অন্যান্য সালাতের সাথে যুক্ত করে এই সালাত চালু করে। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরি ও উদরপূর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদআতি সালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহর গ্যবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।” (মিরকাত শরহে মিশকাত, খন্ড-৩, পৃ. ১৫৭)

(তিরমিযী: ৭৩৯)

জবাব: এই হাদীসটিতেও হাজ্জাজ বিন আরতাত নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার সনদ মুনকাতি হওয়ার কারণে ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদিসগণ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসটি যঈফ বলতে শুনছি। তাহলে এই হাদীসটি কী করে শবে বরাতের পক্ষে দলীল হতে পারে?

প্রকাশ থাকে যে, নিসফে শাবান-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কোন সহীহ-মারফু হাদীস নেই।

৩. ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) জৈনক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি সিরারে শাবানের সিয়াম রেখেছো? লোকটি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে রমায়ানের পরে সিয়াম দুটির কাযা আদায় করতে বললেন।

জবাব: অধিকাংশ বিদ্বানগণের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষাবধি নির্ধারিত সিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা সেটা তার মান্নতের সিয়াম ছিল। রমায়ানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে তিনি শাবানের শেষের সিয়াম দুটি বাদ

দেন। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ঐ সিয়ামের কাযা আদায় করতে বলেন। তাহলে এই হাদীসের সাথে প্রচলিত শবে বরাতের সম্পর্ক কোথায়?

শবে বরাতের সালাত

এই রাত্রির ১০০ রাকআত সালাত সম্পর্কে যে হাদীস বলা হয়ে থাকে তা মাউযু বা জাল। এই সালাত ৪৪৮ হিজরিতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাসাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবি ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী হানাফি (মৃত. ১০১৪ হি.) বলেন, “জুমআ ও ঈদায়নের সালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সালাতে আলফিয়াহ নামে শবে বরাতে যে সালাত আদায় করা হয় এবং এর পক্ষে যেসব হাদীস ও আসার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট, মাউযু অথবা যঈফ। এই বিদআত ৪৪৮ হিজরিতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের জাহিল ইমামরা অন্যান্য সালাতের সাথে যুক্ত করে এই সালাত চালু করে। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরি ও উদরপূর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদআতি সালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার

ব্যক্তিগণ আল্লাহর গ্যবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।” (মিরকাত শরহে মিশকাত, খন্ড-৩, পৃ. ১৫৭)

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকি বা জামাআত বদ্ধভাবে সালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণে ব্যপ্তি লাভ করে। (আত-তাহযীর মিনাল বিদআহ লি শাইখ বিন বায, ১২-১৩ পৃ.)

রুহের আগমন

এই রাত্রিতে বাকি-এ গারকাদ নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যিয়ারত করতে যাওয়ার হাদীসটি (ইবনু মাজাহ, হা.ন. ১৩৮৯) যে যঈফ ও মুনকাতি তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হলো- এই রাতে সত্যি সত্যিই রুহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হতে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কিনা? যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণত ৯৭ নং সূরা আল-কাদরের ৪ ও ৫নং আয়াত দুটি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে,

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّفُوعُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; উষার উদয়কাল পর্যন্ত।

এখানে সেই রাত্রি বলতে লাইলাতুল

আয়িশা (রা.) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে রমায়ান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শাবানের ন্যায় এত অধিক সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তবে শেষের দিকে মাত্র কয়েকটি দিন (সতর্কতার জন্য) সিয়াম ত্যাগ করতেন।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত: ২০৩৬)



কাদর বা শবে কদরকে বুঝানো হয়েছে, শবে বরাতকে নয়- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতই প্রমাণ করে। অত্র সূরায় রুহ অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রুহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন

বিদ্বান করেননি, সম্পূর্ণ তাদের বিবেকপ্রসূত; স্রেফ ধারণা। রুহ শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফিয় ইবনু কাসীর (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এখানে রুহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের অনেক জায়গায়ই জিবরাঈল (আ.)-কে রুহ বলা হয়েছে।

শাবান মাসের করণীয়

শাবান মাসের প্রধান করণীয় হলো অধিকহারে সিয়াম পালন করা। আয়িশা (রা.) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে রমায়ান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শাবানের ন্যায় এত অধিক সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তবে শেষের দিকে মাত্র কয়েকটি দিন (সতর্কতার জন্য) সিয়াম ত্যাগ করতেন।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত: ২০৩৬)

সুতরাং যারা শাবানের প্রথম থেকে নিয়মিত সিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন সিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হোন বা মান্নত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও সিয়াম পালন করতে পারবেন। মোটকথা শাবান মাসে অধিকহারে নফল সিয়াম পালন করা সুন্নাত। সহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে সিয়াম বা অন্যকোন ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের খেলাফ। অবশ্য যারা আইয়ামে বীয-এর তিন দিন নফল সিয়ামে অভ্যস্ত তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শাবানে উক্ত নিয়তেই সিয়াম পালন করবেন, শবে বরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হলে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদআতি কোন আমল রব্বুল আলামীন কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদআতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। রব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআনুল হাকীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিজ নিজ আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প



■ শাইখ মাযহারুল ইসলাম

ভূমিকম্প কেন হয়?

আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে কিন্তু তার খিয়ানত করা হবে (অর্থাৎ যার সম্পদ সে আর ফেরত পাবে না), যাকাতকে দেখা হবে জরিমানা হিসেবে, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত বিদ্যা অর্জন করা হবে, পুরুষ লোক স্ত্রী লোকের আনুগত্য করবে কিন্তু তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ করবে, বন্ধুকে কাছে টেনে নিবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল (বাগড়াঝাটি) হবে, জাতির সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি সমাজের শাসকরূপে আবির্ভূত হবে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, একজন মানুষ যে খারাপ কাজ করে খ্যাতি অর্জন করবে তাকে তার খারাপ কাজের ভয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, বাদ্যযন্ত্র এবং নারী শিল্পীর ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাবে, মদ পান করা হবে (বিভিন্ন নামে মদ ছড়িয়ে পড়বে), শেষ বংশের লোকজন তাদের পূর্ববর্তী মানুষগুলোকে অভিশাপ দিবে, এমন সময় আসবে যখন তীব্র বাতাস প্রবাহিত হবে তখন একটি ভূমিকম্প সেই ভূমিকে তলিয়ে দিবে (ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে বা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে)। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ১৪৪৭)

অত্র হাদীসে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে

যে, রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যমীনে কখন ভূমিকম্পের আযাব প্রদান করা হয় এবং কেন প্রদান করা হয়?

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রব্বুল আলামীন মাঝে মাঝে পৃথিবীকে জীবন্ত হয়ে উঠার অনুমতি দেন, যার ফলে তখন বড় ধরনের ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই ভূমিকম্প মানুষকে ভীত করে। তারা রব্বুল আলামীনের নিকট তাওবা করে, পাপ কর্ম ছেড়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং তাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মুনাজাত করে। আগেকার যুগে যখন ভূমিকম্প হত, তখন সঠিক পথে পরিচালিত সংকর্মশীল লোকেরা বলতো, রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

বিজ্ঞান কী বলে?

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ভূপৃষ্ঠের নীচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নীচে প্রায় ১০০ কি.মি. পুরো একটি শীতল কঠিন পদার্থের স্তর রয়েছে। একে লিথোস্ফেরার (Lithosphere) বা কঠিন শিলাত্বক নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের পৃথিবী নামের এই গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কঠিন শিলাত্বক (লিথোস্ফেরা)-সহ এর ভূপৃষ্ঠ বেশ কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্বকের প্লেট (Plate)-এর মধ্যে খন্ড খন্ড অবস্থায় অবস্থান করছে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে এই প্লেটের চ্যুতি বা

রব্বুল আলামীন মাঝে মাঝে পৃথিবীকে জীবন্ত হয়ে উঠার অনুমতি দেন, যার ফলে তখন বড় ধরনের ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই ভূমিকম্প মানুষকে ভীত করে। তারা রব্বুল আলামীনের নিকট তাওবা করে, পাপ কর্ম ছেড়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং তাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মুনাজাত করে। আগেকার যুগে যখন ভূমিকম্প হত, তখন সঠিক পথে পরিচালিত সংকর্মশীল লোকেরা বলতো, রব্বুল আলামীন আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

নড়া-চড়ার দরুণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্প বিষয়ক কুরআনতত্ত্ব ভূমিকম্প বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরাতুয যিলযাল নামে একটি সূরাই নাযিল করা হয়েছে। মানুষ শুধু কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞানও এই কার্যকারণ সম্পর্কেই আলোচনা করে থাকে। কিন্তু কুরআনুল হাকীম একই সাথে কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ বর্ণনার পাশাপাশি উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী এবং এই ঘটনা থেকে অন্য আরও বড় কোন ঘটনা ঘটার সংশয়হীনতার প্রতি ইংগিত করে। ভূমিকম্প বিষয়ে কুরআনুল কারীমে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো- যিলযাল, যার অর্থ একটি বস্তুর নড়াচড়ায় অন্য আরেকটি বস্তু নড়ে উঠা। দ্বিতীয় শব্দটি হলো- দাক্বা, এর অর্থ হল প্রচণ্ড কোন শব্দ বা আওয়াজের কারণে কোন

মাঝে মাঝে রক্বুল আলামীন ভূমিকম্পসহ আরো অন্যান্য দুর্যোগ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন।

ভূমিকম্প একটি আযাব

রক্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, বল, আমি তোমাদের উপর, তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে) অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম। অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।” (৬ নং সূরা আনআম: ৬৫ নং আয়াত) ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ বর্ণনায় জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে) আযাব নাযিল হলো তখন রাসূল (সা.) বললেন, আমি তোমার সম্মুখ হতে আশ্রয়

টি কাজে লিপ্ত হবে

তখন তাদের প্রতি বালা-মুসিবত আপতিত হতে আরম্ভ করবে। কাজগুলো হল-

১. গনীমতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে।
২. আমানতের সম্পদ পরিণত হবে গনীমতের মাঝে।
৩. যাকাত আদায় করাকে মনে করবে জরিমানা আদায়ের ন্যায়।
৪. পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকের অনুগত হবে।
৫. সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে।
৬. বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে।
৭. পিতার সাথে যুলুম করা হবে।
৮. মসজিদে উচ্চস্বরে হট্টোগোল হবে।
৯. অসম্মানী ব্যক্তিকে জাতির নেতা মনে করা হবে।
১০. ব্যক্তিকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য।

১১. প্রকাশ্যে মদপান করা হবে।
১২. পুরুষ লোক রেশমি কাপড়ের পোষাক পরবে।
১৩. গায়িকা-নর্তকী তৈরি করা হবে।
১৪. বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে।
১৫. পূর্ববর্তী নেককার লোকদের প্রতি পরবর্তীরা অভিসম্পাত করবে।

এই কাজগুলি যখন পৃথিবীতে হতে শুরু হবে তখন অগ্নিবর্ষী প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প ও কদাকৃতিতে রূপ নেয়ার অপেক্ষা করবে। এখন একটু চিন্তা করা উচিত যে আমরা এগুলোর মাঝেই লিপ্ত রয়েছি। আর যখন আমাদের উপর মুসীবত আসে তখন প্রকৃতির বা মানুষের বা অন্যান্য জিনিসের দোষ দেই।

রক্বুল আলামীন প্রদত্ত যেসব দুর্যোগের সম্মুখীন আমরা হই তা আসলে আমাদের গুনাহের কারণেই।

ভূমিকম্প হলে কী করণীয়?

যখন কোথাও ভূমিকম্প সংগঠিত হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষদের উচিত রক্বুল আলামীনের নিকট অতি দ্রুত তাওবা করা, তাঁর নিকট নিরাপত্তার জন্য দুআ করা এবং রক্বুল আলামীনকে অধিকহারে স্মরণ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)

বাকি অংশ ৩০ নং পৃষ্ঠায়

আরেকটি ভূমিকম্প পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং তা হবে আল্লাহর সৈনিক ইসরাফিল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কঠিন শিলাত্বকের স্থানান্তরের কারণে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প আমাদেরকে এ কথার প্রতি ইংগিত করে যে, একদিন ওই দাক্বা সংঘটিত হবে, যার নাম কিয়ামত। তখন এই চাকচিক্যময় দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

কিছু নড়ে উঠা বা প্রবল ঝাঁকুনি খাওয়া। পৃথিবীতে বর্তমানে যেসব ভূমিকম্প ঘটছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে কঠিন শিলাত্বকে চ্যুতি বা স্থানান্তরের কারণে। কিয়ামতের দিন আরেকটি ভূমিকম্প পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং তা হবে আল্লাহর সৈনিক ইসরাফিল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কঠিন শিলাত্বকের স্থানান্তরের কারণে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প আমাদেরকে এ কথার প্রতি ইংগিত করে যে, একদিন ওই দাক্বা সংঘটিত হবে, যার নাম কিয়ামত। তখন এই চাকচিক্যময় দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। মানুষ যেন কিয়ামতকে ভুলে না যায়, দুনিয়াকেই তার আসল ঠিকানা মনে না করে, তাই

প্রার্থনা করছি, অথবা যখন তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব নাযিল হলো, তখন তিনি বললেন, আমি তোমার সম্মুখ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, ৫/১৯৩)।

আবুশ শাইখ আল-ইস্পাহানী এই আয়াতের তাফসিরে বর্ণনা করেন, “বল, আল্লাহ তোমাদের উপর, তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে)- যার ব্যাখ্যা হলো, তীব্র শব্দ, পাথর অথবা ঝড়ো হাওয়া; অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম- যার ব্যাখ্যা হলো, ভূমিকম্প এবং ভূমি ধ্বসের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া।

বান্দার উপর আযাব কেন আসে?

আলী (রা) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন আমার উম্মত ১৫

আপনার শিশুকে যেভাবে গড়ে তুলবেন



■ মুহাম্মাদ তানভীর আহসান

রক্বুল আলামীনের বাণী-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَآخِشُوا
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

হে মানুষ! তোমাদের রবের দেয়া দায়িত্ব
পালন করো এবং সেই দিনকে ভয়
করো, যেদিন সন্তানও পিতার কোন
কাজে আসবে না; আর পিতাও সন্তানের
কোন উপকারে আসবে না। (৩১ নং সূরা
লুকমান: ৩৩)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকই তার ভাই হতে
পলায়ন করবে, পলায়ন করবে তার
মা-বাবা হতে এবং স্ত্রী সন্তান হতেও।
প্রত্যেকেরই নিজের বিপদ-চিন্তাই
অপরকে ভুলিয়ে দিবে। (৮০ নং সূরা
আবাসা: ৩৪-৩৭)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ
السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرْوَنَهَا
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

হে মানব জাতি! নিঃসন্দেহে কিয়ামত
এক ভয়ানক ব্যাপার। সেদিন তোমরা

দেখতে পাবে- প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী
মা তার দুধ পানকারী শিশুকেও ভুলে
যাবে এবং গর্ভধারিণী মা তার গর্ভপাত
করে ফেলবে।... (২২ নং সূরা হাজ্জ:
১-২)

আর সেদিন জাহান্নামীরা বলবে, হে
আমাদের রব! যেসব জিন ও মানব
(মাতা-পিতা, নেতা-নেত্রী) আমাদেরকে
বিপথগামী করেছিল, আজকে তাদের
দেখিয়ে দিন; আমরা তাদের পদদলিত
করবো। যাতে তারা অপমানিত হয়।
(৪১ নং সূরা হামীম আস-সাজদা/
ফুসসিলাত: ২৯)

আমাদের বর্তমান সময়ের অভিভাবকগণ
তাদের সন্তানদেরকে জীবনের
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ
হয়েছেন, এটা শুনতে বেমানান হলেও
পুরোমাত্রায় সঠিক। এর প্রথম কারণ
হলো, অভিভাবকগণ নিজেরাও জীবনের
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তেমন কোন
শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারেননি।
আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আমাদের সমাজ
ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে চরম প্রতিকূল
পারিপার্শ্বিকতা; যা আমাদের জীবনের
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে
সম্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে দেয় না অথবা
ঐ জ্ঞানের উপর স্থির হবার কোন
সুযোগই দেয় না।

আমাদের মনে রাখতে হবে,
সেকুলারিজম (Secularism) বা
ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য হল, মানুষের
বৈষয়িক তথা জাগতিক বিষয় সমূহের
উপর মহান রবের কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণকে

আর সেদিন
জাহান্নামীরা বলবে,
হে আমাদের রব!
যেসব জিন ও মানব
(মাতা-পিতা,
নেতা-নেত্রী)
আমাদেরকে
বিপথগামী করেছিল,
আজকে তাদের
দেখিয়ে দিন; আমরা
তাদের পদদলিত
করবো। যাতে তারা
অপমানিত হয়। (৪১
নং সূরা হামীম
আস-সাজদা/
ফুসসিলাত: ২৯)

অস্বীকার করা। আর তা এভাবে যে, ধর্মবিশ্বাস হলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনে ধর্মকে আনা হবে না। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াল এই, আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিসরে আপনার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র রব আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাহলে যে সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা যত বেশি শক্তিশালী হবে ঐ সমাজে বা রাষ্ট্রের জনগণ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আল্লাহ থেকে ততই বেশি দূরে অবস্থান করবে। আর কোন ব্যক্তি যদি ধর্মনিরপেক্ষতার ঐ বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয় তবে সে আল্লাহর প্রকৃত দীন ইসলাম হতে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়; তার কালিমা, নামায ইত্যাদি তাকে কাফির হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত। সুতরাং বৈষয়িক তথা জাগতিক জীবনের উন্নতি সাধনই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সবই ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শয়তানী

আজকে যে সন্তানকে আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানতা বশত বিভ্রান্ত করছি এরাই কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লানত দিবে, আমাদেরকে পদদলিত করে এরপর জাহান্নামে যেতে চাইবে। আজ যে আদরের সন্তানকে দুনিয়ার ক্লাশ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সমস্যা হলে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু তাদের পরকালীন প্রস্তুতি বা আল্লাহর হুক আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়া থেকে সম্পূর্ণ গাফিল। কিয়ামতের ঐ ভয়ংকর দিনে সেই আদরের সন্তান হবে আপনার শত্রু।

মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদ্বারা শিক্ষিত ও প্রভাবিত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা যেমন আমাদেরকে বলে গিয়েছে; বাবা পড়া-লেখা করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কর, নিজের ও বংশের মুখ উজ্জল করো। আমরাও আমাদের সন্তানদেরকে ঠিক এটাই বলে যাচ্ছি। অতএব আমরা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা গন্তব্য দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই

সীমাবদ্ধ করে দিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে যে সন্তানকে আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানতা বশত বিভ্রান্ত করছি এরাই কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লানত দিবে, আমাদেরকে পদদলিত করে এরপর জাহান্নামে যেতে চাইবে। আজ যে আদরের সন্তানকে দুনিয়ার ক্লাশ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সমস্যা হলে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু তাদের পরকালীন প্রস্তুতি বা আল্লাহর হুক আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়া থেকে সম্পূর্ণ গাফিল। কিয়ামতের ঐ ভয়ংকর দিনে সেই আদরের সন্তান হবে আপনার শত্রু। আপনি জাহান্নামের আযাব হতে আপনার সন্তানকে কীভাবে বাঁচাবেন তা কি চিন্তা করেছেন? কিয়ামতের ঐ ভয়াবহতা নিয়ে উপরে তুলে ধরা আয়াতগুলো নিয়েই আসুন চিন্তা করে দেখি।

তাহলে আপনার আমার প্রধান দায়িত্ব হল, শিশুর জীবনের গন্তব্য সম্পর্কে নিজে স্পষ্ট হওয়া এবং তাকেও স্পষ্ট করানো। এরপর গন্তব্যানুযায়ী পথচলা শেখানো। আমরা আল-বুরকানের পরামর্শ বিভাগে আপনার শিশুর জন্য ধারাবাহিক সহায়িকা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

২৮ নং পৃষ্ঠার পর

অস্বীকার করা। আর তা এভাবে যে, ধর্মবিশ্বাস হলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনে ধর্মকে আনা হবে না। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াল এই, আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিসরে আপনার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র রব আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাহলে যে সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা যত বেশি শক্তিশালী হবে ঐ সমাজে বা রাষ্ট্রের জনগণ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আল্লাহ থেকে ততই বেশি দূরে অবস্থান করবে। আর কোন ব্যক্তি যদি ধর্মনিরপেক্ষতার ঐ বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয় তবে সে আল্লাহর প্রকৃত দীন ইসলাম হতে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়; তার কালিমা, নামায ইত্যাদি তাকে কাফির হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত। সুতরাং বৈষয়িক তথা জাগতিক জীবনের উন্নতি সাধনই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সবই ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শয়তানী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদ্বারা শিক্ষিত ও প্রভাবিত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা যেমন আমাদেরকে বলে গিয়েছে; বাবা পড়া-লেখা করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কর, নিজের ও বংশের মুখ উজ্জল করো। আমরাও আমাদের সন্তানদেরকে ঠিক এটাই বলে যাচ্ছি। অতএব আমরা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা গন্তব্য দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করে দিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে যে সন্তানকে আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানতা বশত বিভ্রান্ত করছি এরাই কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লানত দিবে, আমাদেরকে পদদলিত করে এরপর জাহান্নামে যেতে চাইবে। আজ

যে আদরের সন্তানকে দুনিয়ার ক্লাশ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সমস্যা হলে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই, কিন্তু তাদের পরকালীন প্রস্তুতি বা আল্লাহর হুক আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়া থেকে সম্পূর্ণ গাফিল। কিয়ামতের ঐ ভয়ংকর দিনে সেই আদরের সন্তান হবে আপনার শত্রু। আপনি জাহান্নামের আযাব হতে আপনার সন্তানকে কীভাবে বাঁচাবেন তা কি চিন্তা করেছেন? কিয়ামতের ঐ ভয়াবহতা নিয়ে উপরে তুলে ধরা আয়াতগুলো নিয়েই আসুন চিন্তা করে দেখি।

তাহলে আপনার আমার প্রধান দায়িত্ব হল, শিশুর জীবনের গন্তব্য সম্পর্কে নিজে স্পষ্ট হওয়া এবং তাকেও স্পষ্ট করানো। এরপর গন্তব্যানুযায়ী পথচলা শেখানো। আমরা আল-বুরকানের পরামর্শ বিভাগে আপনার শিশুর জন্য ধারাবাহিক সহায়িকা তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।



মামলা তদবিরে বন্দীদের অভিভাবকগণ যা মনে রাখবেন

বুরকান ডেস্ক :
প্রথমেই সবাইকে এ বিষয়টির উপর
স্থির হতে হবে যে, বর্তমান পুলিশ,
উকিল এবং কোর্টের মামলা
পরিচালনায় জড়িত প্রায় সকলেই
মিথ্যাবাদী, প্রতারক, খেয়ানতকারী ও
ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।
দু'চারজনের বেলায় বিষয়টি ব্যতিক্রম
হলেও তা দিয়ে অন্যদেরকে মূল্যায়ন
করা যাবে না।

আপনি টিভিতে বা পত্রিকায় দেখলেন,
আপনার ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন
কিংবা আত্মীয়দের কেউ অথবা বন্ধুকে
দেখানো হয়েছে এভাবে যে, সে
অন্যান্য কয়েকজনের সাথে বা একাকি

অবস্থায় অস্ত্র-বিস্ফোরক ইত্যাদিসহ
গ্রেফতার হয়েছে। এটা দেখেই সত্য
বলে মনে করার কোন কারণ নেই।
কারণ, পুলিশ বা র‍্যাভের এ ধরনের
নাটক অনেক পুরাতন অভ্যাস, যা তারা
মিডিয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করে থাকে।
এক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে
মিডিয়াকর্মী বা সাংবাদিকদের সাথে
কথা বলতে দেয়া হয় না। কখনো
তাকে অস্ত্র-বিস্ফোরক ইত্যাদির সম্মুখে
দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি তোলা হয়,
আবার কখনো ভিন্ন ভিন্ন ছবি তুলে
মিথ্যা বর্ণনানুযায়ী মিডিয়াতে দেয়া
হয়। সাংবাদিকরাও জানতে পারে না
যে, এভাবে খালি হাতে গ্রেফতার করে
একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে

অস্ত্র-বিস্ফোরক ইত্যাদি দিয়ে গ্রেফতার
দেখানো হলো।

গ্রেফতারের সংবাদ শুনে স্বাভাবিক
থাকুন। সাথে সাথেই টাকা খরচ করতে
শুরু করবেন না। মনে রাখবেন,
তাৎক্ষণিক যেখানে যত টাকা দিবেন,
তার পুরোটাই কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি।

আপনি যখন হঠাৎ করেই কোন
নিকটজনকে যোগাযোগ মাধ্যমে পাবেন
না, বা মনে করছেন হয়ত কেউ তাকে
অপহরণ বা গ্রেফতার করেছে, সাথে
সাথেই দেরি না করে আপনার নিকটস্থ
থানায় জিডি করে রাখুন। এটা মামলার
ক্ষেত্রে আপনাকে পজিটিভ সহায়তা
দিবে। জিডিতে শুধু এতটুকু বলবেন,
আমি আমার অমুককে পাচ্ছি না, এই
দিন এই সময় হতে। জিডির প্রয়োজন
এজন্য যে, ইদানীং বা আগেও পুলিশ
বা গোয়েন্দা সংস্থা একজনকে ধরে
অনেক দিন পর্যন্ত আটক রাখার পর
মিডিয়াতে দেখায়। যেমন— কোন
ব্যক্তিকে আজ বা গতকাল রাতে এই
এই বোমাসহ কুমিল্লা হতে গ্রেফতার
করা হয়েছে মর্মে পত্রিকায় সংবাদ বের
হলো। কিন্তু দেখা যাবে, অনেক দিন
পূর্বেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে
ঢাকাতে তার কলেজ, অফিস বা বাসা
থেকে। তখন কোর্টে তাদের মিথ্যা দাবি
কিছুটা হলেও আশ্বাসি ভূয়া প্রমাণিত
করতে পারবেন ঐ জিডির মাধ্যমে।
কারণ কাউকে গ্রেফতারের ছয় মাস বা
এক বছর পর গ্রেফতার দেখানোর
নজিরও রয়েছে। আর মিডিয়াতে
এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে, যা দেখে
মনে হবে সত্যি সত্যিই বুঝি তাকে গত
রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জিডি করার জন্য অবশ্যই অতি
নিকটজনকে সাথে নিয়ে যাবেন, সম্ভব
হলে এলাকার প্রভাবশালী বা থানাতে
যাতায়াত আছে এমন কাউকে নিয়ে
যাবেন। পুলিশ অনেক সময় কাউকে
সন্দেহজনকভাবে আটক করে।
আটককৃত ব্যক্তির পরিবারে ফোন করে
থানায় যেতে বলে। এক্ষেত্রে থানার
সাথে পরিচিত, বিশেষত স্থানীয়
মেম্বার, চেয়ারম্যান বা প্রভাবশালী

কাউকে সাথে নিয়ে দেন-দরবারের মাধ্যমে কম-বেশি টাকা দিয়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে ভাল হয়। পরবর্তীতে কোর্টের আমেলা হতে বাঁচা যাবে ইনশাআল্লাহ। পুলিশ ফোন না করলেও সরাসরি থানায় খোঁজ নিয়ে এই চেষ্টা করা ভাল। অবশ্যই এই চেষ্টা করতে হবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মিডিয়াতে দেখানোর পূর্বেই। এক্ষেত্রে যে থানায় সে বন্দী আছে বলে আপনি নিশ্চিত হবেন ঐ থানার ওসির সাথে সরাসরি কনটাক্ট করতে হবে। সাবধান! কোন দালালের হাতে টাকা দিবেন না।

আপনার হয়ত ইতিপূর্বে থানা বা কোর্টে যাতায়াতের অভ্যাস নেই। তাই বলে আপনি যেতে ভয় পাবেন না। কেননা বন্দীর নিকটজন হিসাবে আপনার সেখানে যাবার অধিকার আছে; তা সে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন। থানা সংক্রান্ত তদবির আসামিকে কোর্টে চালান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কোর্টে চালান দেয়ার পর পুলিশের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়।

কোর্টে গিয়ে প্রথমেই কোন উকিল ধরবেন না। অনেক উকিল আপনাকে অফার দিবে এত হাজার টাকা দিন, এই ২-৪ দিনেই বের করে দেবো, জামিন নিয়ে দেবো, ইত্যাদি। সাবধান! সবই মিথ্যা ও প্রতারণার কৌশল।

কোর্টে তোলার পর আপনি কোর্টে অথবা জেলগেটে গিয়ে বন্দীর সাথে সাক্ষাৎ করুন। তার মামলার অবস্থা সম্পর্কে শুনুন এবং তার সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে পা বাড়ান। মনে রাখবেন, বন্দী হবার পর একজন ব্যক্তি মামলা ও আইন আদালতের বিষয়াবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে শুরু করেন। সুতরাং থানা, আদালত সম্পর্কিত বিষয়ে বন্দীর পরামর্শ বেশ জরুরি।

মনে রাখবেন, পুলিশ যদি কোন বন্দীকে জঙ্গীবাদ তথা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেএমবি, হুজি, আনসারুল্লাহ, আইএস ইত্যাদি কোন সংগঠনের সাথে জড়িয়ে মামলা দেয়,

আপনার হয়ত ইতিপূর্বে থানা বা কোর্টে যাতায়াতের অভ্যাস নেই। তাই বলে আপনি যেতে ভয় পাবেন না। কেননা বন্দীর নিকটজন হিসাবে আপনার সেখানে যাবার অধিকার আছে; তা সে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন। থানা সংক্রান্ত তদবির আসামিকে কোর্টে চালান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কোর্টে চালান দেয়ার পর পুলিশের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়।

কোর্টে গিয়ে প্রথমেই কোন উকিল ধরবেন না। অনেক উকিল আপনাকে অফার দিবে এত হাজার টাকা দিন, এই ২-৪ দিনেই বের করে দেবো, জামিন নিয়ে দেবো, ইত্যাদি। সাবধান! সবই মিথ্যা ও প্রতারণার কৌশল।

সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। বরং ধৈর্য ধরে ঠান্ডা মাথায় মামলার তদবিরে হাত দিতে হবে।

আপনার পরিবারের বন্দী ব্যক্তিটির মামলা কত নাম্বার কোর্টে বিচারাধীন তা জেনে প্রথমে মামলার কাগজপত্র তুলে তা পড়ে দেখে, যার বিরুদ্ধে মামলা তাকে দিয়ে পড়িয়ে মামলার ওজন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে

হবে। মামলার কাগজ তোলার জন্য উকিল যদি পরিচিত হয় তাহলে পাঁচশত থেকে একহাজার টাকা নিবে। উকিল যদি আপনাকে কোর্ট সম্পর্কে অসচেতন মনে করে তাহলে অনেক বেশি ডিমাল্ড করতে পারে। যদি সর্গশ্রুটি কোর্টের পেশকার বা টাইপ রাইটার বা নথি সংরক্ষকের সাথে পরিচয় থাকে তাহলে উকিলের মাধ্যম ছাড়াই তাদের সহায়তায় সীমিত খরচে প্রাথমিক কাগজপত্র তোলা যেতে পারে।

উকিলকে যে টাকাই দিবেন তা হতে হবে চুক্তি ভিত্তিক। চুক্তির মধ্যে কাজ, সময়সীমা এবং টাকা পরিশোধের পদ্ধতি বলা থাকবে। কাগজ উঠানো, জামিন শুনানী (হিয়ারিং), হাজিরা বিল এসব টুকিটাকি কাজ হবে চুক্তি ও তাগাদা ভিত্তিক। বার বার তাগাদা না দিলে চুক্তি করেও লাভ নেই। এসব কাগজ যত কম টাকার মধ্যে পারা যায় আদায় করতে হবে। কিন্তু বড় ধরনের কন্ট্রাক্ট, যেমন- নির্দিষ্ট সময়ের পর যদি জামিন করানোর গ্যারান্টি কোন উকিল দিতে চায় তাহলে শর্ত হবে এরকম যে, জামিন করে পরে পূর্ণাঙ্গ টাকা পাবেন। প্রাথমিক খরচ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া যেতে পারে। সাধারণত ভাল মানের উকিলগণ এভাবেই চুক্তি করে থাকেন। অবশ্যই কোন না কোন বিশ্বস্ত সূত্রে নিশ্চিত হয়ে এবং বন্দীর সাথে পরামর্শ করে ওজন সমৃদ্ধ উকিল ধরতে হবে। রাস্তার ধারের উকিল ধরে কোন লাভ নেই; শুধুই ক্ষতি আর ক্ষতি।

যে কোর্টে আপনার বন্দীর মামলা বিচারাধীন সেই কোর্টের পিপি, এপিপি, পেশকার, টাইপ রাইটার, নথি সংরক্ষক এদেরকে চিনে রাখুন। এদের সাথে পরিচয় রাখুন। মামলার কোন পর্বে এ পরিচয় কাজে লাগবে। এদের সাথে আসামির কোন অভিভাবকের পরিচয় হতে ভয় পাবার কিছুই নেই।

সর্বোপরি রক্বুল আলামীনের নিকট দুআ বিশেষ জরুরি। প্রয়োজনমত অবশ্যই ইস্তিখারা করবেন। মনে রাখবেন রক্বুল আলামীনের বাণী- নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল! (৪ নং সূরা আন-নিসা: ৭৬)

নারী অধিকার

হে বোন! শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো
কেবল উস্কানি আর প্রতারণা মাত্র!

উম্মে সা'দ

**STOP
VIOLENCE
AGAINST
WOMEN**

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرَّجَالِ جَلَالٌ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

নারীর উপর পুরুষদের যেমন অধিকার
রয়েছে, নারীদেরও রয়েছে পুরুষদের
উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার। আর
তাদের উপর পুরুষদের রয়েছে বিশেষ
শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ

মহা-পরাক্রান্ত-প্রজ্ঞাময়। (২ নং সূরা
আল-বাকারাহ: ২২৮)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর তোমরা লালসা করো না ঐ
বিষয়ের, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের
একের উপর অপরের মর্যাদা বৃদ্ধি
করেছেন। যা কিছু পুরুষরা উপার্জন
করল তা তাদেরই অংশ হবে; আবার
নারীরা যা কিছু অর্জন করল তাও
তাদেরই অংশ। তোমরা আল্লাহর
নিকট অনুগ্রহ কামনা করো। নিশ্চয়
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহা-জ্ঞানী। (৪ নং
সূরা আন-নিসা: ৩২)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন
ও মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকে
কতককে শত্রু বানিয়েছি। শয়তানরা
তো মনোমুগ্ধকর অলংকারমণ্ডিত কথার
দ্বারা প্রতারণা করে থাকে। (৬ নং সূরা
আল-আনআম: ১১২)

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ
إِلَّا غُرُورًا

শয়তান তো শুধু মিথ্যা আশা ও মিথ্যা
ওয়াদা দিয়ে থাকে, যা প্রতারণা ছাড়া
আর কিছুই নয়। (৪ নং সূরা
আন-নিসা: ১২০)

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
পুরুষকে করা হয়েছে নারীর
ব্যবস্থাপক। (৪ নং সূরা আন-নিসা:
৩৪)

কোন শিশু যদি বলে, আমি আমার
পিতা-মাতার মতই অধিকার চাই!
অথবা পিতা-মাতা যদি বলে, শিশুরাও
মানুষ, আমরাও মানুষ; সুতরাং
আমাদেরকেও শিশুর মতই অধিকার
দেয়া হোক তাহলে বিষয়টি কেমন
হবে? সুস্থ মস্তিষ্কধারী যে কেউই বলবে
যে- এটা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিবেচনামূলক
ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে

নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাই এ
শ্লোগানটিও মানুষ শয়তানদের
শেখানো ঐ অলংকারমণ্ডিত,
প্রতারণাপূর্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই
নয়। যারা এই শ্লোগানটি শিখিয়েছে, ঐ
সকল পশ্চিমা দেশগুলোতে নারীরা কী
অধিকার পেয়েছে? তাদেরকে শুধু
পুরুষদের ভোগের পণ্য বানানো হয়েছে
আর পশুবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে জাহান্নামী
হওয়ার পথ প্রশস্ত করা হয়েছে বৈ আর
কিছুই নয়। মুসলিম দেশসমূহেও মানুষ
শয়তানরা ঐ শ্লোগান আমদানি করে
মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত-সম্মান
নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে।
তাদেরকে বানাতে চাইছে শয়তানের
দাসী। আর এসবের মাধ্যমে রব্বুল
আলামীন প্রদত্ত প্রকৃত অধিকার প্রাপ্ত
হতেও আমাদের মা-বোনদের বঞ্চিত
করতে চাইছে। এটাই হলো শয়তানের
প্রতারণা, যা উপরের ঐ আয়াতে তুলে
ধরা হয়েছে।

মূলত: শ্লোগানটি হবে, পুরুষ পাবে
তার নিজস্ব অধিকার, নারী পাবে তার
নারীত্বের অধিকার। এখন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে
শিশু, যুবক, স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন
প্রত্যেকের জন্য থাকবে নিজ নিজ
অধিকারমালা- এটাই হচ্ছে
স্বাভাবিকতা। এখন প্রশ্ন হলো, এই
অধিকার নির্বাচন করার মালিক কে?
এই অধিকার নির্বাচনের আত্মনিরপেক্ষ
মানদণ্ড কী? যদি সমাজের মানুষকে
ছেড়ে দেয়া হয় এই মর্মে যে, তোমরা
তোমাদের অধিকার বাছাই কর তাহলে
কেমন বিশৃঙ্খলা হতে পারে তা
সহজেই অনুমেয়। আবার যদি কাউকে
দেয়া হয় এই দায়িত্ব যে, আপনি এই
শ্রেণির মানুষদের অধিকার বাছাই করে
দিন তাহলে কেমন হবে বলুন তো?
যদি কোন পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়
নারী-পুরুষের অধিকার নির্ধারণ করার,
তবে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের
অধিকারটাই তার মাথায় বেশি খেলবে;
আর নারীকে দেয়া হলেও অবস্থা একই
অবস্থানে গিয়ে ঠেকবে। এজন্যই
আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে মহান
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের
বক্তব্যের দিকে, যিনি সর্বজ্ঞানী, যিনি
একমাত্র পরিপূর্ণ আদল-ইনসাফকারী।
তাই শ্রেণিভিত্তিক মানুষের কার

অধিকার কেমন হবে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই সম্ভব ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ সমাধান দেয়া। এটা যৌক্তিকতা, বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা তথা সর্ববিচারেই নির্ভুল তত্ত্ব। সুতরাং অধিকারের প্রশ্নে সকল নারীদেরই শ্লোগান হওয়া উচিত,

আমরা নারীদের জন্য নির্বাচিত, স্রষ্টা প্রদত্ত অধিকার চাই।

এবার আমরা নারীদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারগুলো তুলে ধরবো, যা জানা থাকলে একজন নারী যথাকর্তৃপক্ষ হতে তার অধিকারগুলো আদায় করে নিবেন এবং সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর আনুগত্যশীলা হতে পারবেন। এছাড়া শয়তানের পাতা ফাঁদ হতে সহজেই নিজেকে হিফায়ত করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

১. কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণে পিতা-মাতা খুশি হবে এবং যথাযথ পিতৃ ও মাতৃস্নেহে তাকে লালন-পালন করবে

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণে মাতা-পিতা, বিশেষতঃ পিতার মুখ কালো হয়ে যেতো। তারা কন্যা জন্মগ্রহণকে অপমানজনক মনে করতো। লোকলজ্জার ভয়ে কন্যা জন্মের সংবাদ গোপন রাখতো। পিতা নিজেও অন্যদের আড়ালে থাকতো এবং প্রচুর সংখ্যায় কন্যা সন্তান হত্যা করা হতো বা জীবন্ত অবস্থায়ই মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হতো। কন্যা সন্তান জন্মদানের ফলে জন্মদাত্রী মাতাও অনেক ধরনের মানসিক নির্যাতনের শিকার হতেন। আমাদের বর্তমান সামাজিক আবহে হত্যা বা জীবন্ত পুঁতে ফেলার মত নৃশংসতা না ঘটলেও কন্যা সন্তান জন্মদানের ফলে পিতা-মাতার মুখ কালো হওয়ার ঘটনা কিংবা কন্যার মাকে মানসিক কষ্ট দেয়ার মত ঘটনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে লক্ষণীয়।

রব্বুল আলামীন এর চরম নিন্দা জানালেন এভাবে-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنْ

الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

আর তারা যখন নিজেদের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে মর্মে সংবাদ শুনে, তখন তাদের চেহারা অপমান আর দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে যায়। সে (কন্যার বাবা) নিজ সম্প্রদায় হতে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এবং চিন্তা করে, অপমান সহ্য করেই তাকে লালন-পালন করবে, নাকি ঐ কন্যাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। তাদের এ সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট! (১৬ নং সূরা আন-নাহল: ৫৮-৫৯)

আরও বলা হয়েছে,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ كِيَاْمَتِهِر دِن سَهِ جِوَبْتُ پْرُوْخِیْت کِنْیَاکَ عِیْیَ پْرَشْن کَرَا هَبَ، کِی اْپَرَاذَہ تَاکَ هِتْیَا کَرَا هَیْهَیْلِی؟ (৮১ নং সূরা আত-তাকভীর: ৮-৯)

রব্বুল আলামীন ঐ সকল নিষ্ঠুর পিতার জন্য বা যারা কন্যা সন্তানের জীবন্ত প্রোথিতকারী তাদের শাস্তি নির্ধারণের পাশাপাশি উক্ত ঘৃণ্য কর্ম হারাম ঘোষণা করেন এবং কন্যা সন্তান জন্মদান সম্পর্কে বলেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা (পুত্র-কন্যা) উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান। (৪২ নং সূরা আশ-শূরা: ৪৯-৫০)

সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) বহু হাদীসে অধিক কন্যা সন্তান লালন-পালনকারী

পিতা-মাতার জন্য বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবেই রব্বুল আলামীন কন্যা সন্তানের প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

২. নারীকে আল্লাহ দিয়েছেন সুরক্ষিত থাকার অধিকার, যেন শয়তানের অনুসারী পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি হতে সে নিজেকে হিফায়ত করতে পারে

ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে তথা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তো নারীদের বেঁচে থাকারই কোন সুযোগ ছিল না; যা আমরা উপরে তুলে ধরেছি। এরপর যারা বেঁচে থাকত তারা শুধুমাত্র ভোগের পসরা ছিল। শয়তানের অনুসারীরা নারীদের খোলামেলা চলাফেরা বা উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ চলাফেরা হতে কেবল জৈবিক স্বাদ নিতো; এককথায় নারীরা ছিল পতিতাদের মতো, ইচ্ছে হলেই পুরুষরা কোন একজনকে নিয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠতে পারতো। ইসলাম রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ঘোষণা করল- না, নারীরাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে পুরুষদের উপর যথার্থ অধিকার। তাদের জীবনেরও আছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। নারী কন্যা, নারী বোন, নারী জায়া-জীবনসঙ্গিনী-অর্ধাঙ্গিনী, নারী জননী। সুতরাং তাদের নিয়ে পশুবৃত্তিতে মেতে উঠা যাবে না। এভাবেই নারীকে সম্মান আর মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে ইসলাম। শয়তানের অনুসারীদের লোলুপ দৃষ্টি হতে পবিত্র বৈবাহিক জীবনের জন্য নিজের সতীত্বকে, চরিত্রকে, সৌন্দর্যকে হিফায়ত করতে ইসলাম নারীকে দিলো সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকার অধিকার তথা পর্দার বিধান। সুতরাং তোমাকে বলছি, হে বোন! তুমি কি জানো, পর্দা তোমার জীবনের অন্যতম অধিকার? কিন্তু শয়তান ও তার অনুসারীরা মনভোলানো শ্লোগানে তোমাকে তোমার অধিকার হতে দূরে রাখতে চায়। কিন্তু কেন? কীভাবে? কী তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য?

(ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংখ্যায়)

অমৃত ফলের আশায় বিষবৃক্ষ রোপণ

ফারিহা তাবাসসুম মীম

সে বহুদিন আগের কথা। এক দ্বীপে ছিল একটি অমৃত ফলের বৃক্ষ। বৃক্ষটি ছিল খুবই সুন্দর ও প্রাণবন্ত। বৃক্ষের ছায়ায় সুশোভিত ছিল দ্বীপের পরিবেশ। সারা বছর অমৃত ফল দিতো বৃক্ষটি। এই ফল খেয়ে দ্বীপবাসির সমস্ত রোগ-ব্যধি ভালো হয়ে যেতো। ফলে আশপাশের অন্যান্য দ্বীপের বাসিন্দারাও এই দ্বীপে এসে বসবাস করতে শুরু করে। অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল দ্বীপের অভিযাত্রা। কিন্তু একসময় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় দ্বীপটি। খুব স্বাচ্ছন্দেই কাটছিল দিন।

কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ছিল বড় দুষ্ট প্রকৃতির। তারা অমৃত বৃক্ষের কোনই যত্ন নিতো না। বরং বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে গরু-ছাগলকে খাওয়াতো। ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা ভেঙ্গে ফেলতো ইত্যাদি। দ্বীপবাসির অত্যাচার, অবহেলায় ধীরে-ধীরে বৃক্ষটি রুগ্ন হতে থাকে। অতঃপর একদিন বৃক্ষটি মারা গেল। কিন্তু দ্বীপবাসির মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না। ক্রমে দ্বীপবাসির মধ্যে রোগ-বালাই দেখা দিতে শুরু করল। কিন্তু তারা এর কোন প্রতিষেধক খুঁজে পেল না। সুতরাং তারাও একে একে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যেতে লাগলো। এমতাবস্থায় তারা অমৃত ফলের কথা স্মরণ করে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো।

এভাবে কিছুকাল অতিক্রম হওয়ার পর হঠাৎ একদিন তারা সাগরপাড়ে একটি চারা দেখতে পেল। যা ছিল ঠিক অমৃত বৃক্ষের মতোই। তারা চারাটিকে তোলে এনে আগের অমৃত বৃক্ষটির পাশেই রোপণ করল। এবার তাদের যত্ন দেখার মতো। পালাক্রমে চারাটিতে পানি দিতে থাকলো। মস্তক গগনমুখি করে বড় হতে লাগলো চারাটি। খুশিতে আপ্ত দ্বীপবাসী। বৃক্ষের সেবায় তাদের রাত-দিন একাকার। তারা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক যে, পরিচর্যার অভাবে যেন আগেরটির মতো এটিও মারা না যায়। সীমাহীন পরিচর্যায় খুব তাড়াতাড়িই বৃক্ষটি ফুলের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অমৃত ফলের আশায় বৃক্ষের পরিচর্যা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিলো বৃক্ষপূজারী দ্বীপবাসী। সময় আসন্ন। তাই বৃক্ষপূজারীদের

চোখে ঘুম নেই। দিন রাত চলে যায় তাদের অমৃত ফলের স্বপ্নে।

অবশেষে বৃক্ষে দেখা দেয় ফল। মহা-ধুমধামের সাথে সবাই সংগ্রহ করে অমৃত ফল। আনন্দে যেন আর তর সইছে না। অতঃপর সবাই মহানন্দে ভক্ষণ করল সে ফল। কিন্তু একি! ফল খেয়ে কেউ বধির হয়ে গেল, আবার কারো চোখ নষ্ট হলো। কারো মস্তিষ্ক বিকার হয়ে গেল, কারো বা স্মৃতিশক্তি লোপ পেল। অবস্থা দেখে দ্বীপবাসিতো একেবারে হতবিহ্বল! তারা ভাবলো— বৃক্ষের বোধ হয় সঠিকভাবে সেবায়ত্ন করা হয়নি। তাই বৃক্ষটি তাদের প্রতি নারাজ। এবার তারা ক্ষমা চেয়ে আবার আত্মনিয়োগ করল বৃক্ষ-সেবায়। লক্ষ্য একটাই, অমৃত ফল তাদের চাই-ই চাই। তাদের সেবা-যত্নে বৃক্ষটি আরো প্রসারিত হলো এবং সময় মতো ফুলে-ফলে পূর্ণ হয়ে উঠল। এবারতো ফল হাতে পাওয়ার জন্য রীতিমত তুলকালাম। একজন অন্যজনকে খুন-গুম, হত্যা করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করল না। তারপর যারা সে ফল ভক্ষণ করল, তাদের অবস্থা পূর্বেরবারের চেয়ে আরো ভয়ানক হয়ে দেখা দিলো। ফল খেয়ে কেউ হলো শারীরিকভাবে পঙ্গু; আবার কেউ হলো মানসিকভাবে। কেউ আবার মনুষ্যত্ব হারিয়ে হয়ে গেল—হিংস্র-উদ্ধত পশুর মতো। তবুও পণ্ডিতরা হাল ছাড়তে নারাজ। তারা ভাবলো— সঠিকভাবে পরিচর্যা না করায় এমন খেসারত দিতে হচ্ছে। কিছু প্রাণহানি হলেও জাতীয় স্বার্থে তারা বৃক্ষের সেবা-যত্ন আরো বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু তারা বুঝতে অক্ষম যে, এটা বিষবৃক্ষ; এটা কখনো অমৃত ফল দিতে পারে না।

পাঠ সহায়িকা

গল্পটির বাস্তবতা বুঝতে হলে, নিম্নের পরিভাষাগুলো জেনে নিন—

গল্পে দ্বীপ বলতে আরব ভূখণ্ড উদ্দেশ্য। অমৃত বৃক্ষ বলতে রব্বুল আলামীন-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ইসলাম, দ্বীপবাসী বলতে মুসলিম জাতি, দ্বিতীয় বৃক্ষটি তথা বিষবৃক্ষদ্বারা মানবরচিত জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পির-বুয়ুর্গ, আলিম-উলামা বা মোল্লাতন্ত্র ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

করেছি অঙ্গীকার

ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল

বঞ্চিতরা এক হয়েছি, করেছি অঙ্গীকার
হাত পেতে নয়, কেড়ে নেবো আজ প্রাপ্য অধিকার।
মার খেয়ে আর মানবো না হার,
আসুক যতই বাধার পাহাড়।
সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে জেগেছি এবার,
অগ্নিগিরির তপ্তলাভা রুখবে সাধ্য কার?

যেথায় যতখানি রক্ত ঝরিয়েছিস তোরা,
দ্বিগুণ বদলা নেবার তরে জেগেছি আজ মোরা।
দজলা-ফোঁরাত জুড়ে আবার বইবে নয়া খুন,
সেই নেশাতেই রক্তে মোদের জ্বলছে যে আগুন।
আটকে রেখে মুখের ভাষা,
যায় না রুখা বুকুর আশা।
বিশ্বজুড়ে মাযলুমেরা জেগেছে আবার,
অগ্নিগিরির তপ্তলাভা রুখবে সাধ্য কার?

চড়ুই পাখির মার খেয়ে আজ মরছে ঈগলবাজ,
ঐ চেয়ে দেখ পড়ছে খসে যালিমশাহীর রাজ।
বক্ষ পেতেই রুখবো যে আজ লক্ষ বাধার বিক্ষ্যাচল,
বিশ্ব জয়ের অঙ্গীকারে জঙ্গীরা সব সামনে চল।
রক্তে মোদের মুক্তিজ্বালা,
ভাঙ্গবো যে সব শিকল-তালা।
একত্ববাদ করবো কায়ম ধরাতে আবার,
অগ্নিগিরির তপ্ত লাভা রুখবে সাধ্য কার?

জিহাদের ডাক

ইবনু আদির-রশীদ শারীফ

এসেছে জিহাদের ডাক,
চলো যুদ্ধের ময়দানে—
আল্লাহর রশ্মি ধরে ছুটে
চলো হে মুসলিম, ছিন্ন বসনে।

হে ঈমানদারেরা, যুদ্ধ করো
তোমরা, কেবলই আল্লাহর পথে।
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না শয়তানের,
থেকো না তাগুতের সাথে।

মৃত্যুকে করোনা ক' ডর,
কেপো না প্রাণভয়ে
ইসলামের পথে লড়ে চলো
তোমরা, এই জগত বিভূয়ে ।।

আল্লাহর পথে যদি বা শহীদ
তুমি হও, হে মুসলিম
কত যে তুমি সম্মানী হবে,
মৃত্যুর মাধ্যমেই অমর হয়ে
আমরণ টিকে রবে।

তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না,
বরং তারা জীবিত আল্লাহর সেই বাণী—
বুকে সদা ধারণ করে চলো,
ইসলামের শত্রুর বুকে আঘাত হানি।
যদি বা মৃত্যুও হয়—
মনে রেখো, শহীদেঁরা কত সম্মানী !

এসেছে হে মুসলিম, জিহাদের ডাক
সারা বিশ্ব চেয়ে দেখুক অবাক
চোখে, আমরা লড়তে জানি,
নিজেকে নয়, আল্লাহকে ভালবাসতে জানি।

খেলা দেখি!

আয় দোস্তু খেলা দেখি, ইহুদি বসদের,
মেরে কুটে সাফ করে মুসলিম ঠগদের।
আহা কী মজা দেখ, কচি-কাঁচা শিশু সব,
কেঁদে কেঁদে গান গায়, ইয়া রব, ইয়া রব।
ওই দেখ শেল পরে, বিমানের গর্জন,
মুসলিম মরে সাফ, কী দারুণ অর্জন।
হা হা হা হাসি পায়, মানুষের নাই ঠ্যাং,
হাতগুলো উড়ে গেছে, হয়ে গেছে কোলা ব্যাঙ।
ওই দেখ শিশুটা মুখ ভরা রক্ত,
দাঁতগুলো ভেঙ্গে গেছে, মাথা খুব শক্ত।
ছিঁড়ে গেছে ডান পা, বাম পাটা বুলছে,
তবু সে উঠবেই মা'র কাছে ছুটছে।
ইহুদি বসদের ছুঁড়ে দেয়া রকেটে,
কাড়ি কাড়ি টাকা আসে, মিডিয়ার পকেটে।
বিধবার কান্নায় পেট ফেটে হাসি পায়,
গাঁজাখোর মুসলিম, নাক ডেকে ঘুম যায়।
আয় দোস্তু খেলা দেখি, ইহুদি বসদের,
মেরে কুটে সাফ করে মুসলিম ঠগদের।
আহা কি মজা দেখ, ইহুদি উৎসব,
মুসলিম মরে গেছে, হয়ে গেছে ভূতসব।

ইবনু হাস্‌সান-এর দু'টি রম্য ছড়া

জানোয়ার!

গোল গোল শোরগোল,
চারিদিকে ওঠে রোল।
প্রিয় দল মারে কিক,
গোল হবে ঠিক ঠিক।
বাজি হয়, রাজি হয়,
জুয়া খেলে নির্ভয়।
ওই দিকে ওঠে রব,
মুসলিম মরে সব।
সিরিয়া, ইরাকে,
লাশ ভাসে ফোরাতে।
কাশ্মীর লড়ে বীর,
আফগান উচু শীর।
উইঘুর মরে লাশ,
বার্মায় দেয় ফাঁস।
বন্দীনি কাঁদে বোন,
কান পেতে শোন শোন।
ধুর ছাই! টাইম নাই,
আফিয়ার ভাই নাই!
টুইটার ফেসবুক,
মুসলিম উজবুক।
পোস্ট দেয় দিন ভর,
ভাঙ্গে কই কার ঘর।
নট নটী ফলোয়ার,
মুসলিম জানোয়ার!

সংবাদ পরিক্রমা

৪ রোহিঙ্গা মুসলিমকে প্রকাশ্যে
পিটিয়ে আহত করলো
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী



গত বুধবার মায়ানমারের মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণ মংদুর হানিস সুরাতা নামক স্থানে নৈশ অভিযান চালায় মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি।

এ সময় উসমান (১৮) ও রাশেদ (২০) নামে দুই রোহিঙ্গা মুসলিমকে আটক করে, যারা দোকানে যাচ্ছিলো সদাই কিনতে। কুফফার বৌদ্ধরা তাদের কোন কথা না শুনে তাদেরকে ব্যাপক প্রহার করে গুরুতর আহত করে এবং গ্রেফতার করে। সেই সাথে গ্রেফতার করে যেই দোকানে তারা সদাই করতে যাচ্ছিলো সেই দোকানী আব্দুল জলিলকেও। তাকেও ব্যাপক মারধর করা হয়।

এর কিছুক্ষণ পর জুবায়ের নামে আরো এক মুসলিমকে আটক করে কুফফাররা। অপরাধ- তার কাছে নাকি একটি বাংলাদেশি সিম পাওয়া গেছে! অথচ জুবায়ের জানায়, সিমটি তার নয়। পরে মারধর করার পর তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সবশেষে ৫০,০০০ হাজার মায়ানমার মুদ্রার বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

৩৮ | আল যুয়ফান | জুন'১৫

সাগরে ছুঁড়ে ফেলা দেয়া হল
৩০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে



তবুও হচ্ছে না শেষরক্ষা। নিজেদের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে দেয়ার পরও তৃপ্তি মিটছে না সন্ত্রাসী বৌদ্ধদের। তাদের আরো টাকা চাই। যেসব মুসলিমরা বাড়তি টাকা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মৃত্যুর দ্বারে। ঠিক একই ঘটনা ঘটলো গত দুই দিন আগেও-

নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সমুদ্রপথে থাইল্যান্ড পাড়ি জমাচ্ছিলো একদল রোহিঙ্গা মুসলিম। কিন্তু মাঝপথেই বাধে বিপত্তি। দালালরা বাড়তি টাকা দাবি কওে বসে। আর টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নারী ও শিশুসহ ৩০ জন মুসলিমকে নিক্ষেপ করা হয় গভীর সমুদ্রে। এর মধ্যে ৪ জন বাঁচতে সক্ষম হয়, আর বাকি ২৬ জনই মারা যায়। আর এভাবেই একের পর এক শেষ হয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের জীবন...

নিজ দেশ মায়ানমারে বৌদ্ধদের অকথ্য নির্যাতন আর নিষ্পেষণের শিকার সেখানকার রোহিঙ্গা মুসলিমরা। খুন, গুম, ধর্ষণ আর পজু হওয়ার ভয়ে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে বহুদিন ধরেই। নিজ দেশে থাকতে না পেরে শেষ সম্বলটুকু

বিক্রি করে দিয়ে সমুদ্র পথে পাড়ি দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে একটুখানি আশ্রয়ের লক্ষ্যে। অথচ সেখানেও মিলছে না মাথা গোঁজার একটুখানি ঠাই।

সিরিয়ায় আসাদ বাহিনীর
বিমান হামলায়
১০ সাধারণ মুসলিম নিহত



গতকাল সিরিয়ার উত্তর ইদলিব প্রদেশে মুজাহিদ্দীনদের নিয়ন্ত্রিত জিসর আশ-শুঘুর শহরের কুনাইয়া গ্রামে আসাদ বাহিনী একযোগে বিমান হামলা চালায়। এতে প্রায় ১০ জন নিরীহ মুসলিম প্রাণ হারান। আহত হন আরো বহুজন। নিহতদের প্রায় সকলেই নারী ও অবুঝ শিশু। (মহান রব তাদের সবাইকেই শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন)

আরাকানে মুসলিম নির্যাতন



(পত্রিকার রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত)

আরাকানের মুসলমান মেয়েদের পর্দা করে ঘরের বাইরে হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মগ মেয়েদের মত মুসলিম মেয়েদের চুল ছোট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এসব আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গ্রাম্য মোড়লদের উপর। এরপর তারা বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পরে মুসলমান মেয়েদের উপর। কোন মুসলমান মেয়েকে বোরকা পরা দেখলে জোরপূর্বক তা খুলে চলতে বাধ্য করে। -কয়েক বছর আগের ঘটনা। দু'মেয়ে রাস্তা দিয়ে বোরকা পরা অবস্থায় তাদের আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। গ্রামের এক মোড়ল দেখে তাদের বোরকা ছিঁড়ে ফেলে। এ ঘটনায় তাদের বাবা (৭৫ বছর বয়সী আব্দুর রশিদ) প্রতিবাদ করেন। মোড়ল তাকে এর জন্য দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। এক ঘণ্টার মাথায় তাকে সেনা ক্যাম্পে তলব করা হয়। নানান মিথ্যা অজুহাতে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সে সব তিনি অস্বীকার করে। এবার শুরু হয় কঠিন ও অমানুষিক নির্যাতন। পরে গ্রামের লোকজন অর্থদণ্ড দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে।

গত কিছুদিন পূর্বে বৃদ্ধ তার দু'মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রয়োজনে পাত্র দেখতে থাকেন। একদিন মগের দুই যুবক এসে তার মেয়েদের বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে সেনা ক্যাম্পে ডাকা হয়। ক্যাম্পে প্রধান তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনা স্বীকার করে বলেন, আমাদের ধর্মে

অমুসলিমদের সাথে বিয়ে-শাদির অনুমোদন নেই। প্রতিত্তোরে নাসাকার অফিসার তাকে বলেন, “তোর কুরআনের যেই পাতায় এ আইন আছে, তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অতি সত্বর এই যুবকদের কাছে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দে।” কথা শুনে টগবগ করে উঠে বৃদ্ধের হিম শিতল রক্ত। যেন আগুন ধরে গেছে! দাঁড়িয়ে যায় তার গায়ের ন্যুজে পড়া পশমগুলো।

কিছুক্ষণ পর ঐ কুলাঙ্গার বৃদ্ধ বাবাকে বলে, “তবে এক শর্তে ঐ যুবকদ্বয়ের কাছে বিয়ে না দিতে পার। আর তাহলো তোমার একজন মেয়েকে আমার কাছে এক সপ্তাহের জন্য এখানে এনে রেখে যাবে।” আর তো সওয়া যায় না। হাতের কাছে একটা পেপার ওয়েট পেয়ে সাথে সাথে ওই সৈনিকের মুখে ছুঁড়ে মারে। এতে তার সামনের দুটো দাঁত পড়ে যায়। এরপর সে চরম উত্তেজনার বশত সৈন্য ডেকে বৃদ্ধ আব্দুর রশিদকে তার মাদ্রাসায় নিয়ে পায়ের দিক থেকে উল্টোভাবে লটকিয়ে পিটাতে থাকে এবং ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তার সারা দেহ। এক পর্যায়ে সে বেহুশ হয়ে যায়। অনেক পরে যখন হুশ ফেরে,

সে দেখে আরও করুণ কাহিনী- তার আদরের দুই দুলালীকে মাঠে বিবস্ত্র অবস্থায় রেখে...।

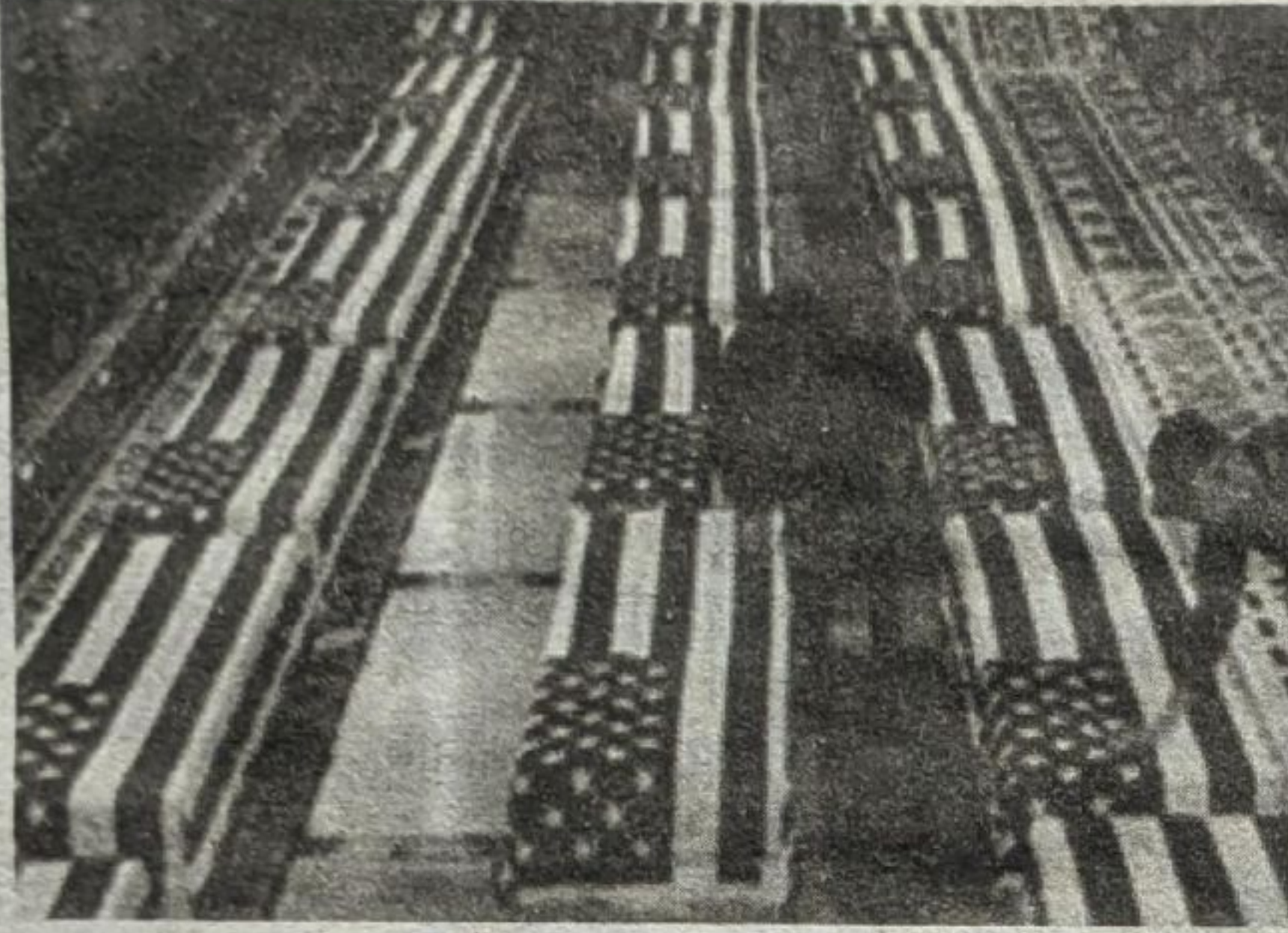
একেকবার মেয়েদের আত্মচিৎকারে আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এক সময় বৃদ্ধ দেখতে পান তার

আদরের কন্যারা আব্দুল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন। কলজে ফাঁটা চিৎকার দিয়ে আরেকবার বেহুশ হয়ে যান তিনি। দ্বিতীয়বার যখন হুশ আসে, তখন দেখেন বেলা যায় যায় অবস্থা। তাকে বলা হলো, এবার তোমার ছুটি। বাড়ি যেতে পারো। অথচ উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তিও তার গায়ে আর অবশিষ্ট নেই। অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরে দেখেন, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে আছে তার পুরো বাড়ি। আর বাড়ির সামনেই উপুড় হয়ে পরে আছে তার একমাত্র জীবনসঙ্গিনীর লাশ!

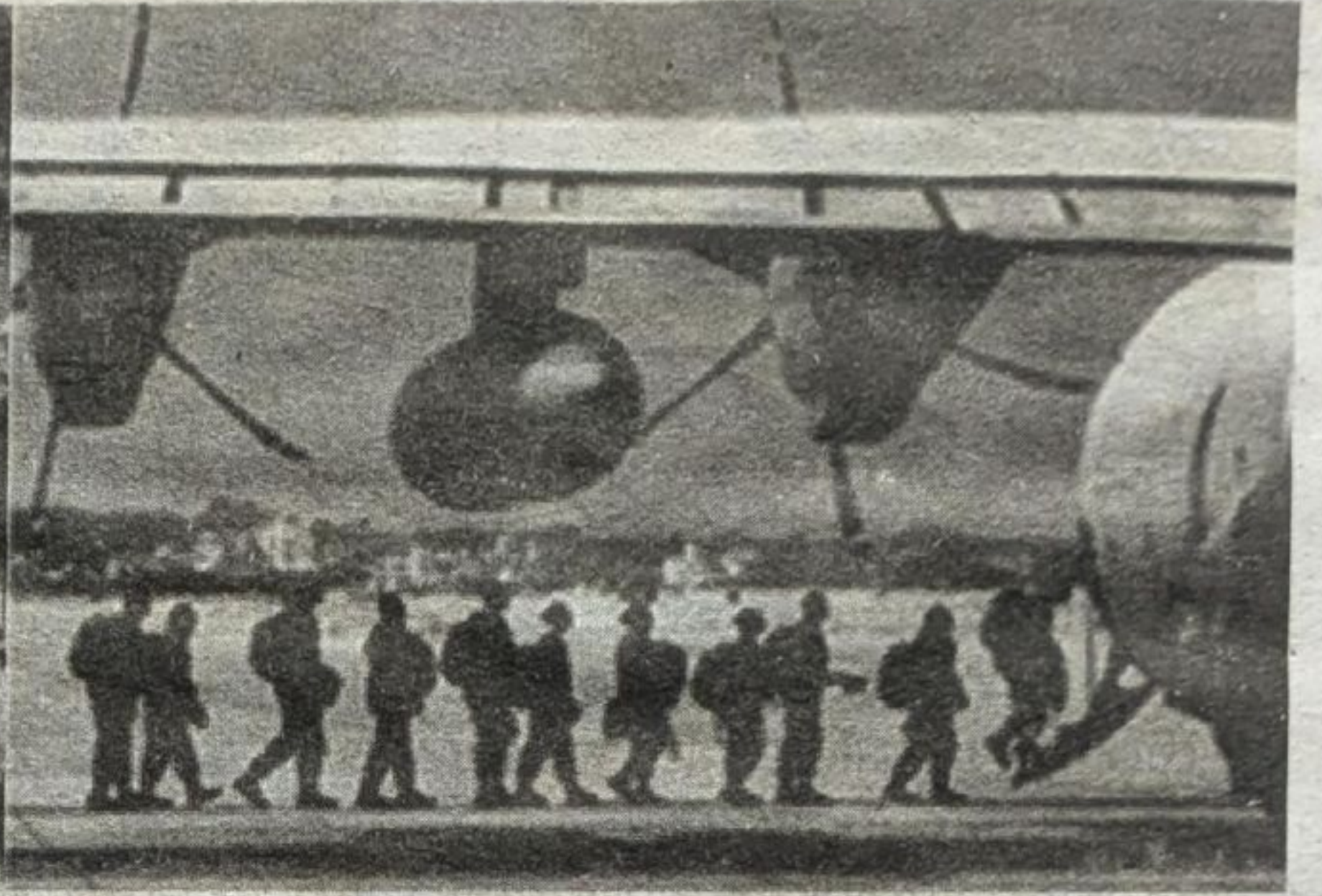
প্রতিবেশীরা জানান, নাসাকা বাহিনীর গুলি মেয়েদের ধরে নিতে আসলে মা তাদের বাধা দিলে তাকে গুলি করে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হয়। এরপর বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মেয়ে দুটিকে ধরে নিয়ে চলে যায়। এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় বৃদ্ধ আব্দুর রশিদের জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা।

এ রকম কত ঘটনার সাক্ষী হিসেবে নির্বাক- স্থির হয়ে আছে আরাকানের মাটি, তা গণনা করার সুযোগ কারো নেই। কারণ সেখানকার আলো, বাতাস সব বন্দি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল থেকে। সংবাদকর্মীদের হাত পা বাধা; সব জায়গায় তাদের যেতে দেয়া হয় না। আরাকানের বাইরের লোকেরা আমরা এই নির্মমতার কিছুই জানি না। আমরা শুধু এটুকু জানি, কিছু দিন পর পর আরাকানের নিরীহ, নিগৃহীত বাসিন্দারা দলে দলে নিজের বাপ-দাদার ভিটে-বাড়ি চিরতরে ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিতে আসে। কেন, কী অপরাধ তাদের? মগ, রাখাইনসহ অন্যান্য জাতি যদি সেদেশে বসবাস করতে পারে তাহলে ইতিহাসের দাবি অনুযায়ী তারা সেখানে প্রকৃত বাসিন্দা হয়েও কেন থাকতে পারবে না? এই প্রশ্ন আজ বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের কাছে রইল।

আফগানিস্তানে ন্যাটো ও মার্কিন যুদ্ধ-মিশনের করুণ পরিণতি



ন্যাটো সেনাদের লাশের বহর



পরাজয়ের গ্লানি মাথায় ঘরে ফিরছে ন্যাটো

সৌজন্যে : বিবিসি

অবশেষে আফগানিস্তানে ন্যাটো ও মার্কিন যুদ্ধ-মিশনের অবসান ঘটান কথা ঘোষণা করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কিন্তু ১৩ বছরের এই দীর্ঘ মিশনের পর আফগানিস্তান এখনও বিপজ্জনক জায়গা। অবশ্য ওবামা আমেরিকার ইতিহাসে দীর্ঘতম যুদ্ধের দায়িত্বশীল সমাপ্তি হলো বলে দাবি করেছে।

১৩ বছরের এ যুদ্ধে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ২,২০০ মার্কিন সেনা। ওবামা বলেছে, যুদ্ধের এই ১৩ বছরে মার্কিন জাতি ও সেনাবাহিনীর জন্য বিরাট পরীক্ষা হয়ে গেছে। ওবামা জানায়, তার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইরাক ও আফগানিস্তানে ১,৮০,০০০ সেনা মোতায়েন ছিল; এখন তা কমিয়ে ১৫ হাজারেরও নীচে আনা হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ সেনাকে দেশে ফেরত নেয়া হয়েছে বলে জানায় সে।

১৩ বছরের আফগান যুদ্ধে ৩,৫০০ বিদেশি সেনা মারা গেছে এবং আমেরিকার খরচ হয়েছে এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ। তবে আফগান যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা

হলেও দেশটিতে ১৩,৫০০ ন্যাটো সেনা অবস্থান করবে যার মধ্যে থাকবে ১১,০০০ মার্কিন সেনা। তারা কেবল প্রশিক্ষণের কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে। আফগানিস্তানে ন্যাটো ও মার্কিন যুদ্ধ-মিশনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘোষণার অনুষ্ঠানটি নতুন বছরের ১লা জানুয়ারিতে পালন করার কথা ছিল। কিন্তু তিন দিন আগেই তা সম্পন্ন করা হয়।

এদিকে তালেবান মুজাহিদ্দীনগণ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১৩ বছরের যুদ্ধে মার্কিন সরকার ও তার মিত্ররা পরাজিত হয়েছে।

দ পাশ্চাত্যের নানা মহল ও বিশেষ করে সংবাদসংস্থাগুলোও ন্যাটো ও মার্কিন সরকারের দীর্ঘতম যুদ্ধে তাদের লজ্জাজনক পরাজয় ঘটান কথা উল্লেখ করেছে। ইউরোপের বাইরে ন্যাটোর প্রথম সামরিক অভিযানও এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ন্যাটোর সেনারা এখন যুদ্ধ বাদ দিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার কাজ বেছে নিয়েছে। আর এই অজুহাতে ন্যাটোর কিছু সেনা এখনও আফগানিস্তানে থেকে যাবে। পশ্চিমা বিশ্লেষকদের

মতেও আফগানিস্তানে ন্যাটো ও মার্কিন সেনাদের পরাজয় খুবই সুস্পষ্ট। কারণ, প্রথমত মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে যে লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল তা অর্জিত হয়নি। মার্কিন সেনারা ২০০১ সালে আফগানিস্তান থেকে তালিবান ও আল-কায়দা গোষ্ঠীসহ কথিত সন্ত্রাসবাদ (জিহাদ) নির্মূলের দোহাই দিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। আমেরিকা ন্যাটো জোটকেও এই যুদ্ধে শরিক করে নেয়। কিন্তু ১৩ বছর পরও আফগানিস্তান থেকে সন্ত্রাস কমানো সম্ভব হয়নি। সেখানে আল-কায়দা ও তালেবানরা এখনো সক্রিয় রয়েছে এবং দিন দিন শক্তি অর্জন করছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আফগানিস্তানে মার্কিন সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য বা টার্গেট ও বাস্তব তৎপরতার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। আসলে ওয়াশিংটন সন্ত্রাস দমনের জন্য আফগানিস্তানে সেনা পাঠায়নি, বরং সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটিকে নিজের সামরিক ও গোয়েন্দা ঘাঁটিতে পরিণত

করতে চেয়েছে।

আফগানিস্তানে তালেবানদের হামলা জোরদারের ঘটনা আফগান সরকারি সেনাদের জন্যও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। তালেবানদের ক্রমবর্ধমান হামলার ফলে বিদায়ী বছর ২০১৪ গত ১৪ বছরের মধ্যে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী বছরে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই তালেবানরা দেশটির ক্ষমতায় তাদের হিস্যা দাবি করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, আফগানিস্তানে মার্কিন সরকারের দ্বিতীয় পরাজয়টি হলো নৈতিক ও সম্মানের পরাজয়। মুসলিম এই দেশটিতে মার্কিন ও ন্যাটো সেনাদের নানা অপরাধের দৃশ্য সেন্সরশিপ আরোপ করেও গোপন রাখা যায়নি। এসব অপরাধের কথা বিশ্ববাসী ও আফগান জনগণ কখনও ভুলবে না। এসব বিষয় লেখকদের কাছে এরইমধ্যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ আফগান প্রজন্মও এটা জানতে পারবে যে, মার্কিন সরকার কিভাবে প্রতারণামূলক নানা শ্লোগান দিয়ে আফগানিস্তানে দখলদারিত্ব ও অপরাধের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাগরামসহ আফগানিস্তানের গোপন বন্দি-শিবিরগুলোতে মার্কিন ও ন্যাটো সেনাদের আর্থিক আর নৈতিক দুর্নীতি মার্কিন সরকারসহ ন্যাটোর জন্য বড় ধরনের কলঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে, যদিও এইসব দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের

সবগুলো দিকের খুব কম অংশই প্রকাশিত হয়েছে। নির্যাতনের শিকার বন্দিরাও তাদের উপর নানা ধরনের নৃশংস নির্যাতনের নানা দিক খুলে বলতে ভয় পাচ্ছে। মার্কিন ও ন্যাটো সেনারা যখন-তখন ও বিশেষ করে রাতের বেলায় আফগানদের ঘরে ঢুকে পড়েছে এবং বেসামরিক ও নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে পশু-পাখি শিকার করার মতই আনন্দজনক কাজ বলে মনে করেছে। এ ছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর কে কয়জনকে হত্যা করেছে তার হিসাব রাখার জন্য নিহত ব্যক্তিদের আজুল কেটে রাখার মত ঘটনাগুলো এই দেশটিতে পশ্চিমা সেনাদের জন্য

তালেবান মুখপাত্র যাবিহ উল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, “পরাজয় ও হতাশার মধ্য দিয়ে এবং অনুভবযোগ্য কিছু অর্জন করা ছাড়াই রব্বুল আলামীনের একান্ত ইচ্ছায় ন্যাটো ও মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে তাদের পতাকা নামাতে বাধ্য হয়েছে। এভাবেই যুগে যুগে রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীকে বিজয় দান করেন সম্মিলিত বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে। তবে আমাদের জিহাদ ততদিন পর্যন্ত চলবে, যতদিন না ফিৎনা সম্পূর্ণরূপে অবসান হয়ে যমীনের কর্তৃত্ব একমাত্র রব্বুল আলামীনের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।”

কাল হয়ে দাঁড়ায়। একবার এক মার্কিন সেনা কান্দাহারে এক আফগানের বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সবাইকে হত্যা করে এবং তাদের লাশও পুড়িয়ে দেয়। মার্কিন সরকার এ ঘটনার ফলে সৃষ্ট জনরোষ কমানোর জন্য ওই মার্কিন সেনাকে কুয়েতে পাঠিয়ে দেয়। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মার্কিন ও ন্যাটোর সেনারা ব্যাপক দুর্নীতির স্বাক্ষর রেখে আফগানিস্তানকে এক্ষেত্রে অনিরাপদ করেছে। দেশটিতে আফিম ও হেরোইন উৎপাদন এবং সেসবের চোরাকারবারে মার্কিন ও ন্যাটো সেনারা ব্যাপক মাত্রায় জড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা প্রকৃত সন্ত্রাসীদেরকে তাদের আয়ের প্রধান উৎস ব্যবহারে সহযোগিতা করে আসছে। আসলে ন্যাটো ও মার্কিন সরকার যদি সত্যিকার অর্থেই সন্ত্রাস দমন করতে চাইতো তাহলে প্রথমেই তাদের উচিত ছিল দেশটিতে আফিমের সমস্ত বাগান ও এর চাষ নির্মূলের চেষ্টা করা।

ব্রিটেন আফগানিস্তানে দশটি গোপন যোগাযোগ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে ডেইলি মেইল খবর দিয়েছে। এসব কেন্দ্রে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়েছিল ব্রিটিশ সেনারা। ব্রিটেন গোপনে তালেবানদের সঙ্গে আঁতাত করার চেষ্টা করছে বলেও খবর ফাঁস হয়। মুসা কেল্লা নিয়ে উভয়পক্ষের লেন-দেনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

আফগানিস্তানে ১৩ বছরের দখলদারিত্বের সময় পাশ্চাত্য এ অঞ্চলে শিয়া-সুন্নি বিরোধসহ নানা ধরনের বিরোধ উষ্ণে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জোরদার হয়েছে। মার্কিন সরকার সিরিয়ার যুদ্ধকেও শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে। আফগানিস্তানে ১৩ বছরের দখলদারিত্বের পরিণামে মধ্য-এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলেও জোরদার হয়েছে জিহাদ। এ বিষয়টি চীন ও রাশিয়ার জন্য উদ্বেগ এবং প্রতিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশ্চাত্যের সেবাদাস সৌদি সরকার সম্প্রতি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বৃহত্তম ইসলামী কেন্দ্র গঠন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়াও পাকিস্তানের অনেক মাদ্রাসা পুনর্গঠন বা নতুন করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবে বলেও জানিয়েছে রিয়াদ। জিহাদি আন্দোলনকে মুকাবিলার জন্য মুসলিম বিশ্বের কথিত আলিম ও চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে জিহাদবিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠার হীন চক্রান্তে মেতেছে আমেরিকা। আর এসব তো সে চক্রান্তেরই অংশ মাত্র!

এদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সম্প্রতি আত্মঘাতী (আত্মোৎসর্গী) হামলার প্রেক্ষাপটে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডমিনিক দ্য ভিল্লিপিন

(Dominique De Villepin)ও বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতিকেই দায়ী করেছে। ভিল্লিপিন বলেছে, “আগে সন্ত্রাসী (মুজাহিদ)-রা ছিল আফগানিস্তানেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ইরাকে ও আফগানিস্তানে পাশ্চাত্যসহ মার্কিন সরকারের হামলা ও বহু বছরের দ্বিমুখী-নীতির কারণে সন্ত্রাস (জিহাদ) এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

রামাদি শহর আইএস মুজাহিদ্দীনদের দখলে



সৌজন্যে-বিবিসি
কয়েকদিনের টানা সংঘর্ষের পর ইরাকের সরকারি সেনাদের পরাস্ত করে রামাদি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইসলামিক স্টেট বা আইএস। গত রোববারও সেখানে মুজাহিদ্দীনদের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। ইরাকি তাগুতি প্রশাসন বলেছে, সরকারি সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে এবং আইএস তাদের বিজয় ঘোষণা করেছে। তবে এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগন বলেছে, আইএস যদি রামাদি দখলে নিয়েও থাকে তাহলেও এটা কৌশলগতভাবে আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠবে না। অথচ রামাদি শহরকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এটি ইরাকের সবচেয়ে বড় প্রদেশ আনবার-এর রাজধানী। রাজধানী বাগদাদ থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১১২ কিলোমিটার। পশ্চিমে রাজধানী বাগদাদ থেকে সিরিয়ার সীমান্ত এবং

ইরাকের সাথে জর্ডান ও সিরিয়ার সংযোগ পথ এই প্রদেশেই পড়েছে।

আল-বাগদাদী শহর আইএস মুজাহিদ্দীনদের দখলে



সৌজন্যে-বিবিসি
ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আল বাগদাদী শহরটি জঙ্গি (যোদ্ধা)-গোষ্ঠী আইএস দখল করে নিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দখলকৃত এই শহরের কাছেই রয়েছে মার্কিন একটি সেনা ঘাঁটি, যেটিতেও আত্মঘাতী (মূলত শব্দটি হবে আত্মোৎসর্গী) বোমা হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল আইএস।

পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছে, গত কয়েক মাসের মধ্যে এবারই প্রথম নতুন করে কোনও এলাকা নিজেদের দখলে নিতে পেরেছে আইএস। তবে, নতুন করে ভূমি দখল করার এই বিষয়টিকে পরিস্থিতির অবনতি হিসেবে এখনও মনে করছে না জন কিরবি।

ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলের আনবার প্রদেশে অবস্থিত আল বাগদাদী শহরের মাত্র ১০ কিলোমিটারের চেয়েও কম দূরত্বে রয়েছে মার্কিন সেনা ঘাঁটিটি। মার্কিন এই সেনা ঘাঁটিতেও আইএসের যোদ্ধারা আত্মঘাতী বোমা হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল এবং সেটিকে প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘাঁটিটিতে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর অন্তত ৩০০ সদস্য আছে, যারা ইরাকি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে নিয়োজিত।

গত বছর থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় ব্যাপকভাবে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আইএস এবং সেই কর্ম

তৎপরতার অংশ হিসেবেই এই দুটো দেশের বিরাট এলাকা আইএস দখল করে নিয়েছে। আইএসকে ঠেকাতে এখন একযোগে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশ।

আফগান মুজাহিদ্দীন কতক হেলমান্দ প্রদেশে গভর্নর হাউজে ফিদায়ী হামলা: ২৭ তাগুতি সৈনিক নিহত, গুরুতর আহত ৩০



গত ১৯ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের লঙ্করগাহ শহরের গভর্নর হাউজে মুজাহিদ্দীনরা একটি সফল ফিদায়ী (আত্মোৎসর্গী) হামলা পরিচালনা করেন। এতে অংশ নেন ৪ জন মুজাহিদ ভাই। ভাইয়েরা প্রথমে গভর্নর হাউজে প্রবেশ করে ৪ জন রক্ষীকে জাহান্নামে পাঠান। তারপর সেখানে কমান্ডো হামলা করে আরো ২৩ জন কাফির সৈন্যকে হত্যা করেন। হামলায় আহত হয় আরো ৩০ জন কাফির।

এই সফল ফিদায়ী হামলা পরিচালনার সময় ২ জন মুজাহিদ ভাই শাহাদাত বরণ করেন। রবুল আলামীন তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন। অপর ২ জন মুজাহিদ ভাই পরদিন সকালে সুস্থ শরীরে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে আসেন। আল্লাহু আকবার! ফালিহ্লাহিল হামদ!!

কুনান প্রদেশে মুজাহিদ্দীনদের সাথে তাগুতি বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ

গত ২০ এপ্রিল রোববার আফগানিস্তানের কুনান প্রদেশের সারকানি জেলার মুজাহিদ্দীনদের সঙ্গে কুফফার সেনাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় মুজাহিদ্দীনরা ৮ জন কাফিরকে জাহান্নামে পাঠায়। এদিকে গতকাল (২১ এপ্রিল) আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশে কুফফার সৈন্যদের সাথে মুজাহিদ্দীনদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এ সময় কুফফার বাহিনীর ১ জন কমান্ডারসহ মোট ৫ জন কুফফার সেনা নিহত হয়। আহত হয় আরো বেশ কয়েকজন।

তাগুতি পুলিশের গাড়িবহরে হামলা নিহত ৯



গত ২০ এপ্রিল আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের খান-ই-শিন জেলার মুজাহিদ্দীনরা কুফফার পুলিশের ২টি গাড়িতে একযোগে হামলা চালায়। এই হামলায় ৯ জন কুফফার পুলিশ নিহত হয় এবং আহত হয় আরো বেশ কয়েকজন। এসময় একজন মুজাহিদ ভাই আহত হন এবং অপর একজন মুজাহিদকে রক্বুল আলামীন শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

মুজাহিদদের হামলায় ৫ তাগুতি পুলিশ নিহত

গতকাল আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশের বাঘলান মারকাজি জেলার মুজাহিদ্দীনদের একটি বোমা হামলায় কাফির পুলিশদের বহনকারী একটি ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়ে অন্তত ৩ জন পুলিশ নিহত হয়। এছাড়া অপর একটি বোমা হামলায় আরো ২ জন কুফফার পুলিশ নিহত হয়।

মুজাহিদদের সফল রকেট ও বোমা হামলা : নিহত ৩



গত ১৯ এপ্রিল শনিবার আফগানিস্তানের পূর্ব লাগমন প্রদেশের দৌলত শান জেলার মুজাহিদ্দীনদের রকেট হামলায় ১ জন কুফফার পুলিশ নিহত হয়। একই প্রদেশের আলিঙ্গার জেলার মুজাহিদ্দীনদের বোমা হামলায় আরো ২ জন কুফফার পুলিশ নিহত হয়।

ইয়েমেনের বিমানবন্দর মুজাহিদ্দীনদের দখলে

ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বিমানবন্দর দখল করে নিয়েছে আল-কায়েদা ইয়েমেনের শাখার মুজাহিদ ভাইয়েরা। মুজাহিদ্দীনরা ইয়েমেনের হাযরা মাওত রাজ্যের বন্দর

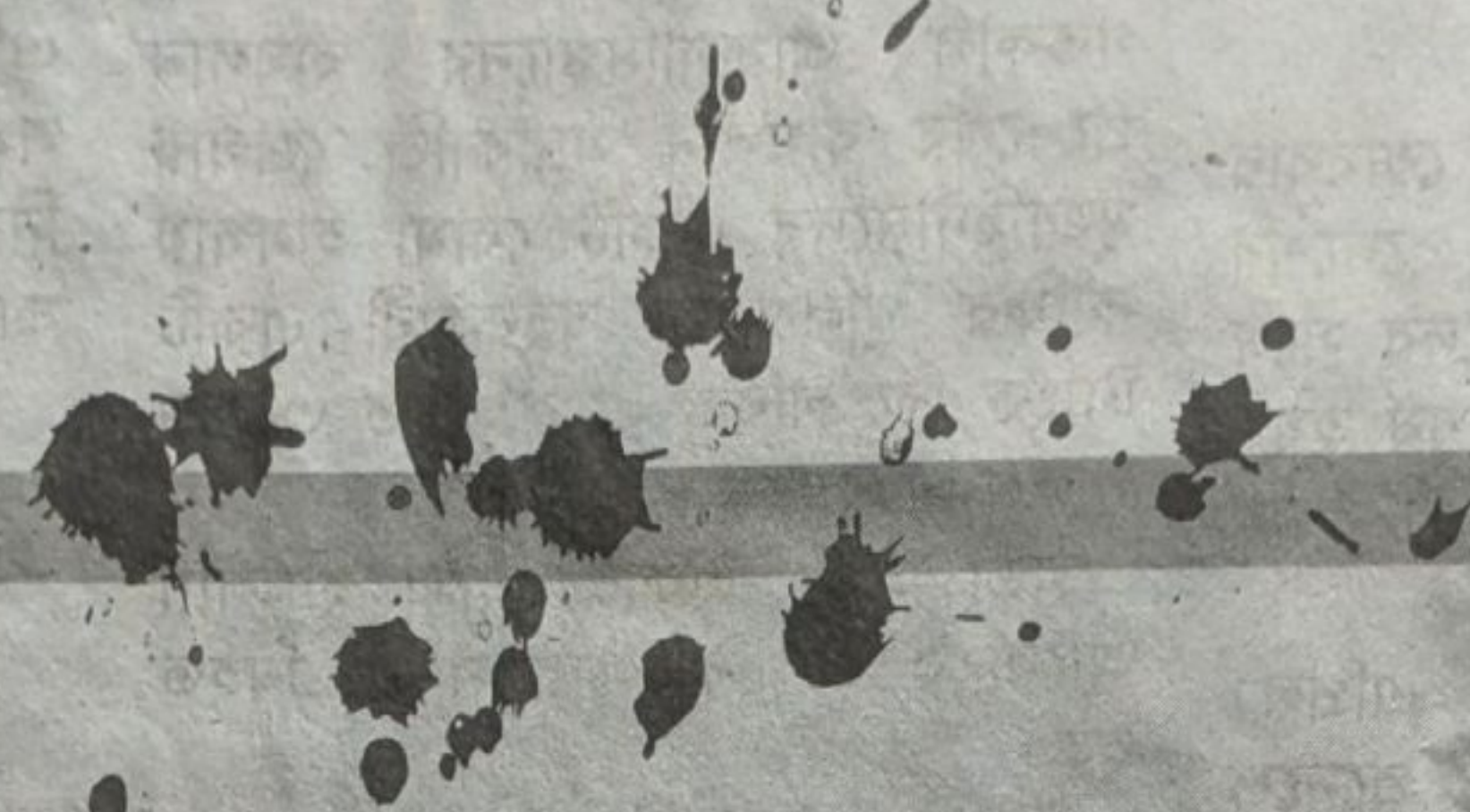
নগরী মুকাদ্দা শহরে সম্মিলিত হামলা চালায়। হামলার সময় ওই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা পালিয়ে যায়। আর সেটির দখল নিয়ে নেয় মুজাহিদ্দীনরা।

এছাড়াও মুজাহিদ্দীনরা একটি সমুদ্রবন্দর ও তেল টার্মিনালও তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। আল্লাহ্ আকবার! ফালিল্লাহিল হাম্দ!!

আফগানিস্তানে ফিদায়ি হামলায় নিহত ২০



আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ খোস্তে এলাকায় এক ফেদায়ি হামলায় অন্তত ২০ তাগুতি সেনা-পুলিশ নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক সংসদ সদস্যসহ আহত হয়েছে আরও অর্ধশত। বৃহস্পতিবার (০২ এপ্রিল) পাকিস্তান সীমান্তের কাছে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ খোস্তে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রাদেশিক গভর্নরের অপসারণ দাবিতে স্থানীয় এক সংসদ সদস্যের কার্যালয়ের সামনে চলা গণপ্রতিবাদের সময় তাগুতি বাহিনী ও তাওয়াগীতদের লক্ষ্য করে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে তালেবান।



দয়াময় রব্বুল আলামীন বলেন,
আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা
কিতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম) করছো না
আল্লাহর পথে? অথচ দুর্বল নারী,
পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশুরা ফরিয়াদ করে
বলছে— হে আমাদের রব! বের করো
আমাদের যালিম অধ্যুষিত এই ভূখন্ড
থেকে। আর পাঠাও তোমার পক্ষ হতে
বন্ধু ও সাহায্যকারী। (কুরআনুল
হাকীম, ৪: ৭৫)





প্রশ্নোত্তর

ডা. মামুনুর রশীদ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

০১. প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে, যখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, “তোমরা আদমকে সিজদা কর” তখন তারা সকলেই সিজদা করল; কিন্তু ইবলিস ব্যতীত। এরপর ইবলিস শাস্তি প্রাপ্ত হল। এখন, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল বলা হচ্ছে, তাহলে কি ইবলিসও ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? নাকি ইবলিসকে আলাদাভাবে সিজদা করতে বলা হয়েছিল? পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে কী বলে?

০১. উত্তর: হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনেই এর পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে। প্রথমত: ইবলিস ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত, এটা নিশ্চয়তা সহকারেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ রব্বুল আলামীন বলেছেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ “স্মরণ করো যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম তোমরা সবাই আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলিস সিজদা করতে অস্বীকার করল; আর সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত।” (১৮ নং সূরা আল-কাহাফ: ৫০)

দ্বিতীয়ত: ইবলিস ফেরেশতাদের ঐ সমাবেশে থাকার সুযোগ পেয়েছিল। ঐ সমাবেশে ফেরেশতাদের সংখ্যা কত ছিল তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে আমাদের ধারণায় বা কুরআনের বর্ণনা ধারায় অগণিতই মনে হয়। মূলত: আদেশ ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যেই ছিল, তাই কুরআনে বার বার এটা বলা হয়েছে, “যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম।” তৃতীয়ত: ইবলিসকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছিল, এটাও কুরআনুল হাকীমে রব্বুল আলামীনের ভাষ্যে এসেছে এভাবে—

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ “হে ইবলিস! আমি যখন তোকে সিজদা করতে আদেশ করলাম তখন কিসে তোকে সিজদা করতে বাধা দিলো?” (৭ নং সূরা আল-আরাফ: ১২)
সুতরাং সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীনের জন্যই, যিনি আল-কুরআনের বক্তব্যে কোন ফাঁক বা ত্রুটি অন্বেষণের সুযোগ রাখেননি। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে কষ্ট হয়।

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

আর তারা যে দৃষ্টান্ত বা বক্তব্যই নিয়ে আসে; তার সত্য-সঠিক ও উত্তম ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দিয়ে দেই।
(সূরা আল-ফুরকান: ৩৩)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي
إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

তোমাদের জানা না থাকলে, যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা আন-নাহল: ৪৩)

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

০২. প্রশ্ন: কবরের আযাব সম্পর্কিত কুরআনুল হাকীমের কিছু আয়াত জানতে চাই।

০২. উত্তর: কুরআনুল হাকীমের ৪০ নং সূরা আল-মুমিন: ৪৬, ৯ নং সূরা আত-তাওবা: ১০১, ৬ নং সূরা আল-আনআম: ৯৩, ১৪ নং সূরা ইবরাহীম: ২৭; এই চারটি আয়াত এবং আয়াতসমূহের হাদীস ভিত্তিক তাফসির পাঠ করুন। আর হাদীস ভিত্তিক তাফসির গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাফসিরে ইবনে কাসীর পাঠের প্রতিই আমাদের বিশেষ নির্দেশনা থাকবে। বিশেষভাবে ১৪ নং সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াতের তাফসির পাঠে ভুলবেন না। যারা আলিম তারা তাফসির গ্রন্থের মূল আরবিটা পাঠ করবেন এবং সাধারণ পাঠকের জন্য তাফসিরে ইবনে কাসীর বাংলা অনুবাদ হয়েছে। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি জগতসমূহের রব।

সিরাজুল ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

০৩. প্রশ্ন: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সম্বোধনে কুরআনুল হাকীমে মোট কতটি আয়াত কোন্ কোন্ সূরায় রয়েছে এবং উক্ত আয়াতসমূহের বিশেষ গুরুত্ব কী?

০৩. উত্তর: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বলেন- যখন তোমরা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু শুনতে পাও তখন কান লাগিয়ে দাও এবং ওর প্রতি মনোসংযোগ কর, হয়তো আল্লাহ কোন ভাল কাজের নির্দেশ দিবেন অথবা কোন মন্দ কাজের নিষেধ করবেন। (ইবনে কাসীর)
আমরা দেখতে পাই- কুরআনুল হাকীমে মোট ৮৯টি আয়াতে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সম্বোধন রয়েছে। সম্বোধনটির যথার্থ বাংলা হচ্ছে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! সম্বোধনটি যোগ করে রক্বুল আলামীন

ঈমান আনয়নকারী প্রত্যেককে কোন না কোন আদেশ-নিষেধ জারি করেছেন। মূল আয়াত ৮৯টি হলেও উক্ত সম্বোধন দ্বারা কয়েকশ বিষয়ের নির্দেশ বা নিষেধ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই আয়াতে একাধিক বা কয়েকটি বিষয়ের আদেশ-নিষেধ রয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্বোধনযুক্ত আয়াতটিসহ পরবর্তী এক বা একাধিক আয়াত পর্যন্ত এমনকি কয়েক আয়াত পর্যন্ত সংযুক্তি বাচক অব্যয় (ওয়াও) সহযোগে উক্ত আহ্বানের পরিধি বাড়িয়ে অতিরিক্ত আদেশ-নিষেধ জারি করা হয়েছে। আয়াতগুলোর গুরুত্ব ঈমানদার যে কোন পাঠকই তার পাঠের বেলায় অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা এখানে আয়াতগুলোর অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে ধরছি। ঈমানদার ভাই-বোনদের নিকট আহ্বান, আপনারা কুরআনুল হাকীম থেকে আয়াতগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠ করবেন। যাদের আরবি ভাষার উপর দখল নেই তারা অবশ্যই বাংলা অর্থসহ পাঠ করবেন এবং প্রয়োজনে তাফসির গ্রন্থ বা উস্তাদের সহায়তায় আয়াতসমূহের আদেশ-নিষেধগুলো আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হবেন।

মোট ২০টি সূরায় উক্ত ৮৯টি আয়াত এসেছে। আমরা সূরার নাম ও সূরার ক্রমিক নাম্বারসহ উক্ত ৮৯টি আয়াতের নাম্বার তুলে ধরছি। পাঠকগণ অবশ্যই মূল আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আহ্বানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী আয়াতগুলোও পড়ে নিবেন। তবে মূল ৮৯টি আয়াত আগে আত্মস্থ করে নিবেন।

১ নং সূরা আল-বাকারাহ, মোট ১১টি। আয়াত নং ১০৪, ১৫৩, ১৭২, ১৭৮, ১৮৩, ২০৮, ২৫৪, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৮, ২৮২।

৩ নং সূরা আল-ইমরান মোট ৭টি। আয়াত নং ১০০, ১০২, ১১৮, ১৩০, ১৪৯, ১৫৬, ২০০।

৪ নং সূরা আন-নিসা, মোট ৯টি। আয়াত নং ১৯, ২৯, ৪৩, ৫৯, ৭১, ৯৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৪।

৫ নং সূরা আল-মায়িদা, মোট ১৬টি। আয়াত নং ১, ২, ৬, ৮, ১১,

৩৫, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৮৭, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১০৬।

৮ নং সূরা আল-আনফাল, মোট ৬টি। আয়াত নং ১৫, ২০, ২৪, ২৭, ২৯, ৪৫।

৯ নং সূরা আত-তাওবা, মোট ৬টি। আয়াত নং ২৩, ২৮, ৩৪, ৩৮, ১১৯, ১২৩।

২২ নং সূরা আল-হাজ্জ, ১টি। আয়াত নং ৭৭।

২৪ নং সূরা আন-নূর, মোট ৩টি। আয়াত নং ২১, ২৭, ৫৮।

৩৩ নং সূরা আল-আহযাব, মোট ৭টি। আয়াত নং ৯, ৪১, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৬৯, ৭০।

৪৭ নং সূরা আল-মুহাম্মাদ, মোট ২টি। আয়াত নং ৭, ৩৩।

৪৯ নং সূরা আল-হুজুরাত, মোট ৫টি। আয়াত নং ১, ২, ৬, ১১, ১৩।

৫৭ নং সূরা আল-হাদীদ, ১টি। আয়াত নং ২৮।

৫৮ নং সূরা আল-মুজাদালাহ, ৩টি। আয়াত নং ৯, ১১, ১২।

৫৯ নং সূরা আল-হাশর, ১টি। আয়াত নং ১৮।

৬০ নং সূরা আল-মুমতাহিনা, মোট ৩টি। আয়াত নং ১, ১০, ১৩।

৬১ নং সূরা আস-সফ, মোট ৩টি। আয়াত নং ২, ১০, ১৪।

৬২ নং সূরা আল-জুমুআ, ১টি। আয়াত নং ৯।

৬৩ নং সূরা মুনাফিকুন, ১টি। আয়াত নং ৯।

৬৪ নং সূরা আত-তাগাবুন, ১টি। আয়াত নং ১৪।

৬৬ নং সূরা আত-তাহরীম, মোট ২টি। আয়াত নং ৬, ৮।

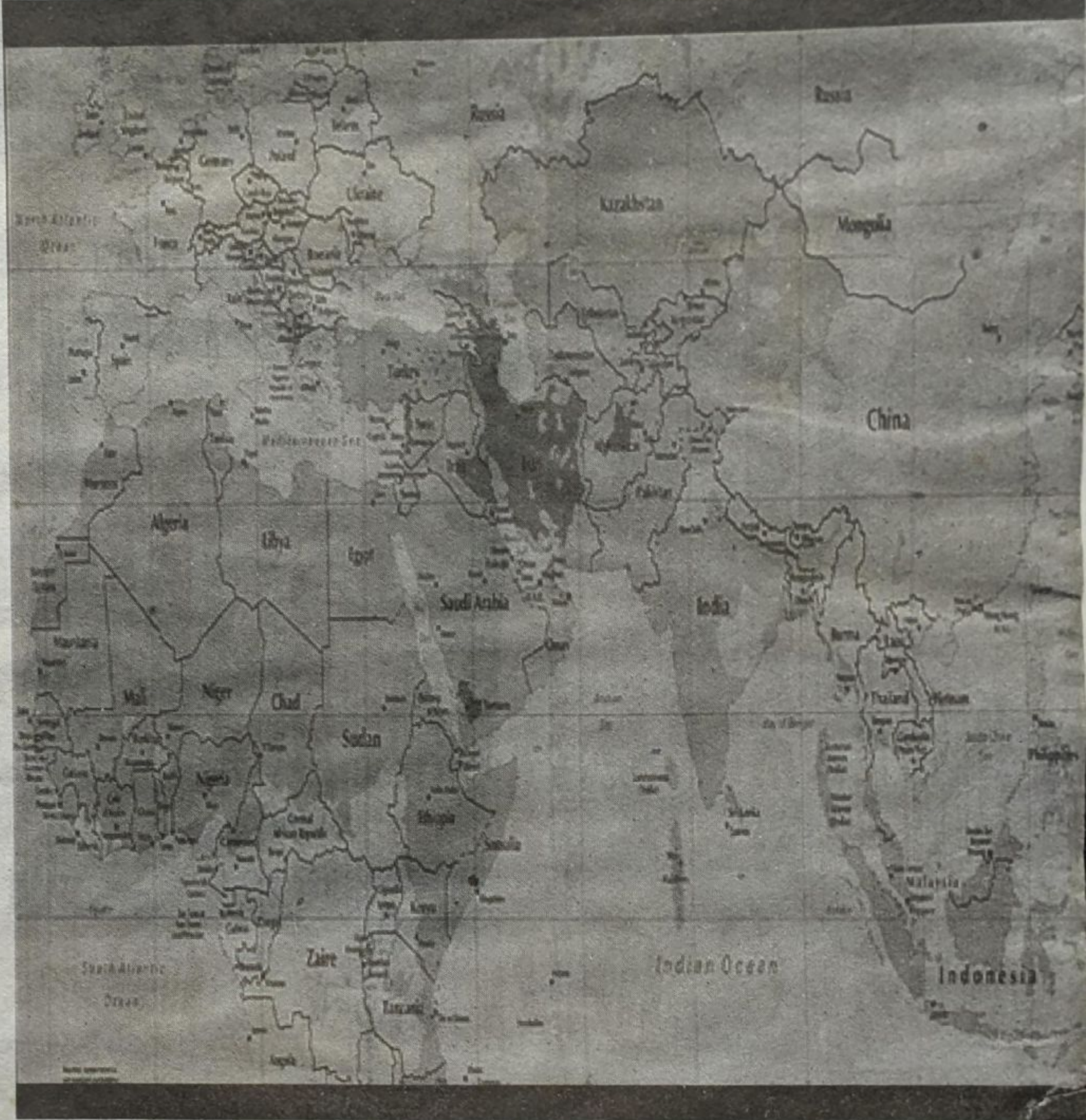
আপনার
যে কোন
প্রশ্নের উত্তর জানতে
আমাদের মেইল
করুন
উত্তর দিবেন অভিজ্ঞ
মুফতিগণ

মুসলিমদের সীমান্ত

আজ মুসলিমদেরকে তাদের মানচিত্র বা বর্ডার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের মানচিত্র বা বর্ডারের কথা উল্লেখ করে থাকে। অথচ মুসলিম ভূমিসমূহকে পার্থক্যকারী মানচিত্রে অঙ্কিত এসব তাগুতী বর্ডার কখনো আল্লাহর দীনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আজ আমরা আমাদের বর্ডারও ভালভাবে চিনি না। মূলত আমাদের বর্ডার হলোঃ-

ম্যাপ- মুসলিমদের ম্যাপ শুরু হয়েছে ইসলামিক স্পেন থেকে, মস্কোসহ কাজাখিস্তান, গিরিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, সিমালে তুর্কমেনিস্তান, (বর্তমান চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ, যেখানে ইদানীং মুসলিমদের উপর চলছে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নিধনযজ্ঞ), ভারত, বাংলাদেশ, আরাকান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোমালিয়া, সুদান, মালি, আলজেরিয়া, মরক্কো পর্যন্ত। এই হলো আমাদের বর্ডার। এর মাঝখানে রয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং আফ্রিকার সুদান, মিশর, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ।

এসব দেশ এই সেদিনও চলেছে রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত আইন-কানুন, বিধি-বিধান অনুযায়ী। অথচ আজ সেখানে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ইসলাম, কুরআন, ইসলামী আইন-কানুন... নিয়ে প্রকাশ্যে উপহাস ও বিদ্রূপ চলছে। অনেক বিজ্ঞজনের প্রশ্ন করেও সঠিক উত্তর পাইনি- ১৭৫৭ সালের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজরা এই ভারত উপ-মহাদেশ দখল করার আগ পর্যন্ত সেখানে কোন্ আইন-বিধান বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল? অনেক তালাশের পর আমরা দেখলাম যে, তখনকার রাজ-বাদশারা অত্যাচারী ছিল বটে; কিন্তু আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করার মাধ্যমে তাগুতে পরিণত হওয়ার মতো সাহস



তাদের ছিল না। অথচ আজ সেই ইসলামী আইনের কথা বললেই মৌলবাদী বলে গালিগালাজ করা হয়, জঙ্গী-সন্ত্রাসীর অপবাদ ঘাড়ে চাপিয়ে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রিমান্ডের নামে নির্মম নিপীড়ন চালানো হয়, আলিম-উলামাদেরকে অন্যায়ভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়; তাঁরা নাকি তাগুতের আইন লঙ্ঘন করেছে! তাগুতকে বর্জন করা আল্লাহর নির্দেশ। এটি কুরআনুল হাকীমের সুস্পষ্ট একটি বিধান। অথচ সেই তাগুত সম্পর্কে কথা বলাই নাকি... তাঁদের অপরাধ! তাঁরা নাকি রাষ্ট্রদ্রোহী!!

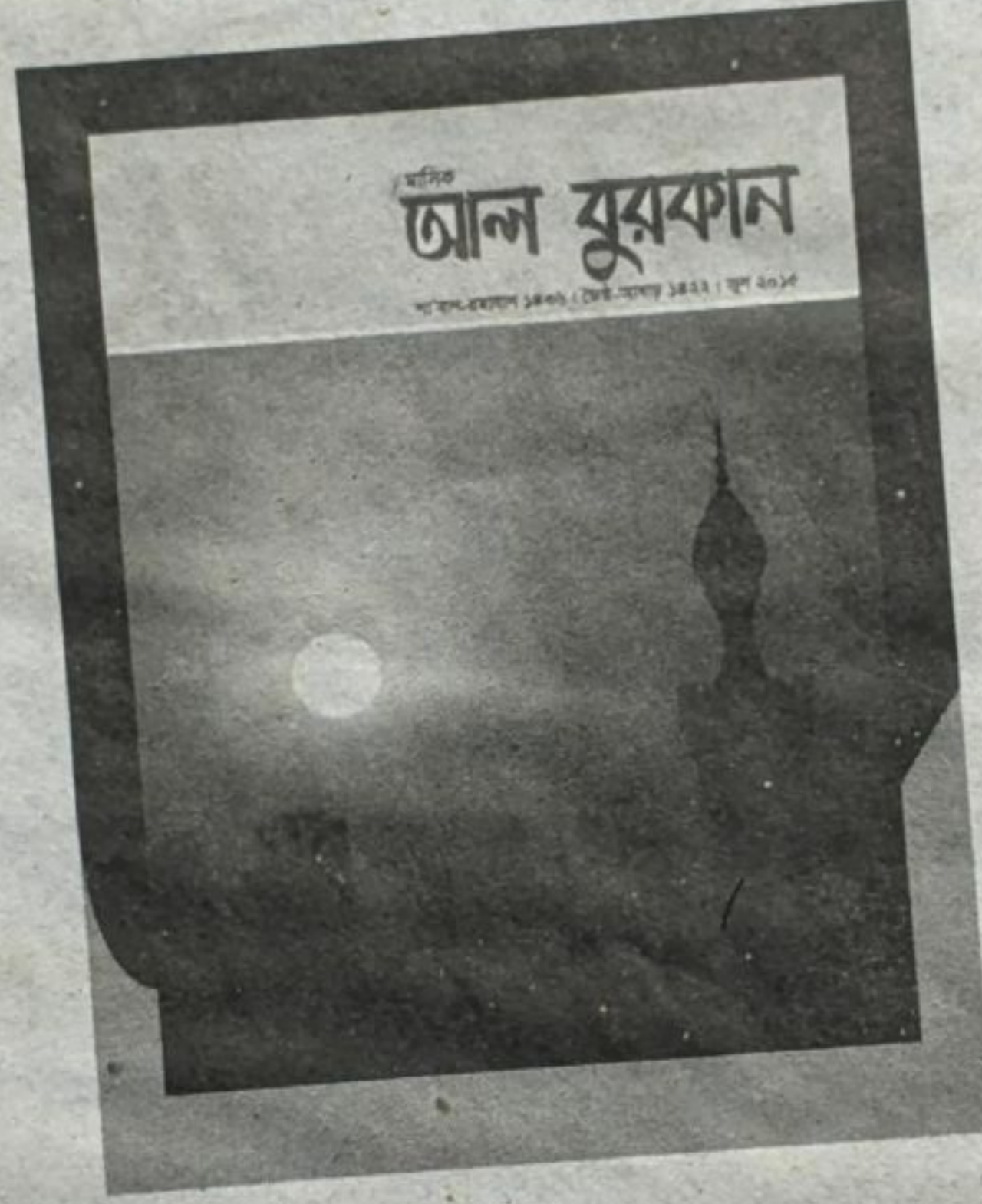
রাষ্ট্রদ্রোহিতা? সমস্ত রাজত্ব তো আল্লাহর। সেই আল্লাহর রাজত্বে যারা আল্লাহর আইনকে অচল ঘোষণা করে আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে বিপরীতে নিজেরা আইন প্রণয়ন করার অযৌক্তিক স্পর্ধা দেখাচ্ছে, তাদের চেয়ে বড় রাষ্ট্রদ্রোহী আর কে হতে পারে? তারা আল্লাহর সাথে দ্রোহ করেছে। তারা আল্লাহদ্রোহী নমরুদ, ফেরাউন, হামান, কারুনের গদীতে আসীন হয়েছে! সাবধান, এরাই এযুগের ফেরাউন!!

মাসিক

ইকামাতে দীনের মুখপত্র

আল যুরকান

প্রথম বর্ষ, প্রস্তুতি সংখ্যা



পাড়ুন

লিখুন

শরিক হোন
মুকাতিলীনদের
এই জামাআতে

প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও

যেকোন প্রয়োজনে

alburqan2015@gmail.com

আহ্বান, অনুরোধ!

“হে আমার জাতি! এটা কেমন ব্যাপার যে, আমি তোমাদের আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, অথচ তোমরা আমার আহ্বান করছো জাহান্নামের দিকে! তোমাদের আহ্বান তো কুফর ও শিরকের দিকে; আর আমার আহ্বান মহা-পরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে!”
(কুরআনুল হাকীম, ৪০ : ৪১-৪২)

● আল-বুরকান প্রচলিত ধারার কোন সাময়িকী নয়, যা অপ্রয়োজনীয় রম্য-রচনা ও গল্প-উপন্যাসে ভরা থাকবে। বরং এটি একটি শিক্ষা কোর্স, একটি গাইডলাইন, যাতে রয়েছে জীবন পরিচালনার পাথর, হারানো চেতনা ফিরে পাবার মাধ্যম, সঠিক আদর্শের পুনর্জীবনী শক্তি ও কুরআনের জ্ঞান আহরণের অনুপ্রেরণা। সুতরাং প্রত্যেক পাঠকের জন্যই অনুরোধ, এর হক আদায়ে যেন সাধ্যানুসারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।

● সাময়িকীর প্রতিটি পর্বে তুলে ধরা কুরআনুল হাকীমের আয়াতগুলো ভালভাবে পাঠ করার ও মনে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পর্বের শুরুতে তুলে ধরা আয়াত বা হাদীস নির্বাচন করা হয়েছে সর্গশ্রুটি পর্বের লিখার শিরোনাম অথবা সর্গশ্রুটি পর্বকে কেন্দ্র করে অথবা পুরো লিখাটির সার-নির্বাস আয়াতগুলো। সুতরাং, উপরের আয়াতগুলো পাঠে তুলে ধরা হবে না।

আমাদের জাতিতে কুরআনুল হাকীমের প্রতিটি পর্বের শুরুতে তুলে ধরা আয়াত বা হাদীস নির্বাচন করা হয়েছে সর্গশ্রুটি পর্বের লিখার শিরোনাম অথবা সর্গশ্রুটি পর্বকে কেন্দ্র করে অথবা পুরো লিখাটির সার-নির্বাস আয়াতগুলো। সুতরাং, উপরের আয়াতগুলো পাঠে তুলে ধরা হবে না।

● পরিশেষে বলি- যাঁরা রক্ত-ঘাম করা প্রচেষ্টায় আজ সাময়িকীটি আপনার হাতে, শেষ রাতের অশ্রুশিলিত মুনাজাতে সুরণে থাকে যেন তাদের কথা।